বাঙ্গালার গীতি কবিতা

শাক্ত সাহিত্য ধারায়—রামপ্রসাদ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের
অপ্রকাশিত রচনা

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী সম্পাদিত

সাহিত্য-ভবন
বজ বজ
শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত

১৩৪০ সাল

মূল্য এক টাকা চারি আনা

কলিকাতা ২১ নং পটুয়াটোলা লেন,
ক্লাসিক প্রেস হইতে
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পুত্র
স্বর্গীয় চিররঞ্জন দাশের
স্মৃতির উদ্দেশ্যে অর্পিত হইল।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী
সম্পাদক

প্রবন্ধ সম্পাদকের বক্তব্য

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ১৮৭০ খৃঃ ৫ই নবেম্বর শনিবার বেলা ৪।৪৮ মিঃ সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যু হয় ১৯২৫ খৃঃ ১৬ই জুন মঙ্গলবার ৫ ঘটিকার সময়ে। তিনি ৫৪ বৎসর ৭ মাস ১২ দিন জীবিত ছিলেন।

১৮৯৪ খৃঃ তিনি ব্যারিষ্টারী ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং তাহার পর বৎসর ১৮৯৫ খৃঃ তাঁহার প্রথম গীতি-কবিতার পুস্তক 'মালঞ্চ' বাহির হয়। ২৫ বৎসর বয়স হইতেই তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট ৩০ বৎসব তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

কবি হিসাবে তাঁহার রচিত নিম্নে লিখিত গ্রন্থগুলি আমরা দেখিতে পাই।

(১)	মালঞ্চ	১৮৯৫ খৃঃ প্রকাশিত
(২)	মালা	১৯০৪ খৃঃ "
(৩)	সাগর-সঙ্গীত	১৯১৩ খৃঃ "
(৪)	অন্তর্যামী	১৯১৪ খৃঃ "
(৫)	কিশোর-কিশোরী	১৯১৫ খৃঃ "

১৮৯৫ হইতে ১৯১৫ এই ২০ বৎসর তিনি তাঁহার আদর্শ অনুযায়ী এই পাঁচখানি গীতি-কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

এই সময় মধ্যে ১৯১৪ খৃঃ 'ডালিম' ও ১৯১৫ খৃঃ 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা'— এই দুইটি ছোট গল্পও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। কবি চিত্তরঞ্জনকে ছোট গল্পের লেখক হিসাবেও আমরা পাই। অতঃপর বাঙ্গালার গীতি-কবিতার ধারায় বাঙ্গালা সাহিত্যের এক অতি নিপুণ সমালোচক হিসাবেও তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাই। প্রথম দেখিতে পাই ১৯১৪ খৃঃ মুন্সিগঞ্জে 'কবিতার কথা' তিনি পাঠ করেন। 'নারায়ণ' ১৩২১, ফাল্গুনে উহা প্রকাশিত হয়।

তাহার পর ১৯১৬ খৃঃ বাঁকীপুর সাহিত্য সম্মিলনে 'বাংলার গীতি কবিতা' তিনি পাঠ করেন। 'নারায়ণ' ১৩২৩, পৌষ সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হয়।

১৯১৭ খৃঃ কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্‌টিটিউটে 'রূপান্তরের কথা' তিনি পাঠ করেন। নারায়ণ ১৩২৩, চৈত্রে উহা প্রকাশিত হয়।

পরে ১৯১৭ খৃঃ "বাংলার গীতি কবিতা" বগুড়া উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে পাঠ করেন।

বগুড়ার বক্তৃতার পর ১৯১৮ খৃঃ ফেব্রুয়ারী, মার্চ্চ, এপ্রিল এই তিন মাস 'ইণ্ডিয়ান-মেসেঞ্জার' পত্রিকায় বগুড়ার বক্তৃতার তুমুল প্রতিবাদ হয়। এই প্রতিবাদ প্রবন্ধের নাম **Obscurantism Paraded.** তখন শুনা গিয়াছিল এবং জানাও গিয়াছিল যে, স্যার ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় নিজে এই প্রতিবাদ লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়া তৎকালীন "প্রবাসী", "ভারতী" ও "সবুজপত্র" যে যাহার দিক হইতে যত খুসী চিত্তরঞ্জনের এই বগুড়ার বক্তৃতার প্রতিবাদ ত' বটেই, নিন্দাবাদও যথেষ্ট করিয়াছেন।

এই সমস্ত প্রতিবাদের কতকাংশের উত্তর দিতে গিয়া বাদ-প্রতিবাদ মুখে বাঙ্গালার গীতি-কবিতার ধারায় ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত রামপ্রসাদের বিস্তৃত সমালোচনা ও রাজা রামমোহনের 'ব্রহ্ম-সঙ্গীতের সহিত তাহার তুলনা ১৯১৯ খৃঃ মধ্যে তিনি লিখিয়া শেষ করেন।

১৯২০ খৃঃ হইতে তিনি সম্পূর্ণভাবে সর্ব্বত্যাগী হইয়া রাজনীতিতে যোগ দেন এবং ১৯২১ খৃঃ হইতে তিনি ব্যারিষ্টারী ব্যবসা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেন।

সুতরাং এই প্রবন্ধগুলি ১৯১৯ খৃঃ রচিত হইলেও তিনি এগুলি আর প্রকাশ্য সভায় পাঠ করিবার বা প্রকাশ করিবার অবকাশ পান নাই।

১৯২৫ খৃঃ এপ্রিল মাসে আমি তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য পাটনা

গিয়াছিলাম। ইহা তাঁহার মৃত্যুর মাত্র দুই মাস পূর্ব্বের ঘটনা। সেই সময়েও তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমাদের সম্মুখে এই প্রবন্ধগুলির আলোচনা ও পাঠ করেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর এই প্রবন্ধগুলি আমার কাছেই ছিল। এতদিন তস্তত: করিয়া এক্ষণে তাহা আপনাদের নিকট প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়া আমি অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেছি এবং সেই সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার মহাশয় এবং শ্রোতৃবর্গকে আমি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। *

* প্রবন্ধগুলির স্বত্বাধিকারী হিসাবে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষা বিভাগে গত ১৯৩৪ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ১৪ই, ১৫ই, ১৭ই ও ১৮ই তারিখে ঐগুলি যথাক্রমে পাঠ করি।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ, বাঙ্গালা ভাষা বিভাগের অধ্যক্ষ, এই চারিটি বক্তৃতায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধ চতুষ্টয় পাঠ হইবার পর তিনি নিম্নলিখিতরূপ বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

"স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশের লিখিত এবং পূর্ব্বে অপ্রকাশিত এই চারিটি প্রবন্ধ যাহা শ্রীমান গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী পাঠ করিলেন, তাহা ভাষায় ও ভাব প্রকাশের সৌন্দর্য্যে অনুপম এবং কবি রামপ্রসাদের প্রতিভা বিশ্লেষণে এক নূতন পথের সন্ধান আমরা পাইলাম। শ্রীমান গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী আমার ছাত্র। তিনি একজন সাহিত্যসেবী ও পণ্ডিত ব্যক্তি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যে সময়ে 'নারায়ণ' মাসিকপত্র সম্পাদন করিতেছিলেন, সেই সময়ে শ্রীমান গিরিজাশঙ্কর তাঁহার দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। তিনি এই অপ্রকাশিত প্রবন্ধগুলি এতদিন সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের নিকট আসিয়া যে পাঠ করিলেন, এই জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

"শ্রীমান গিরিজাশঙ্কর আমাদিগকে প্রবন্ধ পাঠের পূর্ব্বে এইখানে বলিয়াছেন যে, দেশবন্ধু ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই এই প্রবন্ধগুলি লেখা শেষ করেন। কিন্তু ঐ সময়ে সহসা রাজনীতিতে যোগদান করায় এগুলি পাঠ করিবার বা প্রকাশ করিবার

সুযোগ তিনি পান নাই। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে পাটনা সহরে দেশবন্ধুর জীবন-চরিত-লেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও শ্রীমান গিরিজাশঙ্করের সম্মুখে দেশবন্ধু নিজে পুনরায় এইগুলি পাঠ, আলোচনা ও সংশোধন করেন। দেশবন্ধু পূর্ব্বে বাঁকিপুর, বগুড়া প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালার গীতিকবিতার-ধারা শীর্ষক যে কতকগুলি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান অপ্রকাশিত প্রবন্ধগুলিও ঐ সমস্ত প্রবন্ধকে অনুসরণ করিয়া ক্রমশঃ ধারাবাহিকরূপে লিখিত হইয়াছে।

"শ্রীমান গিরিজাশঙ্কর বাহিরের এবং আভ্যন্তরিক অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগে সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, এই প্রবন্ধগুলি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের লিখিত এবং ইহাতে সন্দেহের ছায়াপাত করিবার বিন্দুমাত্র হেতু আমাদের নাই।

"বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য এই প্রবন্ধগুলি ছাপা হওয়া প্রয়োজন, কেননা বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনা বিভাগে ইহা এক অতি নূতন ও মৌলিক গবেষণামূলক বলিয়া আমি মনে করি। বিশেষতঃ ইহা এমন এক ব্যক্তির লেখা যাঁহাকে তৎকালে বাঙ্গালা সাহিত্যের "Revivalist school"-এর একজন সর্ব্ব-প্রধান নায়ক বলিতে আমি কোন দ্বিধা অনুভব করি না। আমার নিজের ইচ্ছা যতই থাকুক, বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশের ভার ও দায়িত্ব লইতে আমি এক্ষণে পারিতেছি না বলিয়া দুঃখিত। কিন্তু আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ইচ্ছা করি যে, এই প্রবন্ধগুলি ছাপা হওয়া উচিত।

"যাহা হউক, আমি আশা করি, শ্রীমান গিরিজাশঙ্কর যিনি দেশবন্ধুর এক অতি অনুরাগী ভক্ত বলিয়া বিদিত, তিনি নিজেই সাহিত্য-সেবীদের উপকারের জন্য এগুলি প্রকাশের ভার নিশ্চয়ই লইবেন।

"আমার আর কিছু বক্তব্য নাই। পরিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে, ভদ্র-মহিলা ও ভদ্র-মহোদয়, আপনাদের পক্ষ হইতে, শ্রীমান গিরিজাশঙ্করকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি, যেহেতু তিনি দেশবন্ধুর অপ্রকাশিত এই অমূল্য রত্নগুলি এতদিন সযত্নে রক্ষা করিয়া এক্ষণে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।"

(মূল ইংরাজী বক্তৃতার প্রকাশিত অনুলিপি 'এডভান্স' 'অমৃত বাজার' ও 'ফরওয়ার্ড' হইতে অনূদিত।)

বাঙ্গালার গীতি কবিতা

শাক্ত সাহিত্য ধারায়—রামপ্রসাদ

প্রথম পল্লব

[বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষত, বিশ্ব-বাঙ্গালার গীতি-কবিতার ইতিহাসের দুইটি ধারা,—একটি শাক্ত ধারা ও আর একটি বৈষ্ণব ধারা। শাক্ত সাহিত্যের ধারায় রামপ্রসাদ। কবিকঙ্কন হইতে শাক্তধারা প্রবাহিত। বাঙ্গালা সাহিত্যের বৌদ্ধধারা অস্পষ্ট কিংবা লুপ্ত-প্রায়। পরবর্ত্তী শাক্ত ও বৈষ্ণব ধারায় বৌদ্ধধারা তাহার স্বাতন্ত্র্য রাখিতে পারে নাই। শাক্ত ও বৈষ্ণব ধারায় বৌদ্ধ সাহিত্যের লুপ্তপ্রায় ধারা লুক্কায়িত আছে। শিবশক্তি অভেদাত্মক বলিয়া "শিবায়ণ"গুলি শাক্ত ধারার অন্তর্গত। অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে শাক্ত ধারায় ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ। ইহা বাঙ্গালায় পলাশী যুদ্ধের কাল।

রামপ্রসাদের গানের মন্দিরে প্রবেশের পথে এ যুগের বাঙ্গালীর পক্ষে অনেকগুলি বাধা আছে। একাধিক রামপ্রসাদ ছিল কি না? রামপ্রসাদের গানের শ্রেণী বিভাগে প্রথম শ্রেণী—সাধনের সময় রচিত। ২য় শ্রেণী—সাধন হইতে সিদ্ধির পথে যাইতে রচিত। ৩য় শ্রেণী—সিদ্ধি বা সমাধির অবস্থায় রচিত। রামপ্রসাদের উপর সংস্কৃত মুসলমানী ও বৈষ্ণব প্রভাব ছিল।]

১

আমি বাঙ্গালী। বাঙ্গালার প্রাণকে খুঁজিতে যাওয়া আমার স্বধর্ম্ম। বাঙ্গালার গানের এই সুর ও রূপের মধ্যে আমি বাঙ্গালার প্রাণকেই খুঁজিতেছি। (১) বাঙ্গালার গানের একটা স্বরূপ আছে।

"স্বরূপ বিহনে রূপের জনম
কখন নাহিক হয়।"

(১) বাঙ্গালার মাটি, বাঙ্গালার জলকে সত্য করিতে হইলে বাঙ্গালীর কবিতাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইবে।"

(২) (ক) "বঙ্গ সাহিত্যের সেই হারান ধারাকে আবার খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সে মরে নাই, একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই,—সরস্বত নদীর মত বালুকারাশির মধ্যে লুকাইয়া আছে। সেই বালি খুঁড়িয়া তাহাকে বাহির করিতে হইবে।'

"বাঙ্গালা কবিতার যথার্থ প্রাণ কি, তাহা আমি বুঝি ও কতকটা জানি। তাহারি গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমার হাতের কলম কেহ কাড়িয়া লয় নাই সত্য। কিন্তু আমি ত সাধক নই, সাহিত্য-মন্দির-প্রাঙ্গণে সামান্য কিঙ্কর মাত্র। সেই গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার ক্ষমতা আমার নাই। যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের দুর্ভাগ্য যে আমার অপেক্ষা অনেক বেশী।"

[মুন্সীগঞ্জ অভিভাষণ ১৯১৪]

(খ) "বাঙ্গালার জল, বাঙ্গালার মাটির মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। সেই সত্য যুগে যুগে আপনাকে নব নব রূপে, নব নব ভাবে প্রকাশিত করিতেছে।...ঐ বাঙ্গালার গীতি-কবিতায় আমি তাহার সন্ধান পাইয়াছি। বাঙ্গালা কবিতার প্রাণ ও বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর্শ যে কি, তাহা বোধ হয় বলিবার সময় আসিয়াছে।"

[বাঁকীপুর অভিভাষণ ১৯১৬]

বাঙ্গালা সাহিত্যে, শিল্পে, গানে, চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, বাঙ্গালার ধর্ম্মসাধনায়, বাঙ্গালীর দশকর্ম্মে,—সমাজস্থিতি ও গতির ব্যবহারের—যত বিভিন্ন বিচিত্র রূপের জন্ম হইয়াছে, সমস্তই বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপ হইতে। এক বহু হইয়াছে, বিচিত্র হইয়াছে।

"নবরে নব নিতুই নব
যখনি হেরি তখনি নব।" (২)

(গ) "আমার বাঙ্গালার এক চিরন্তন আদর্শ আছে। আজ আপনাদের আমি সেই বাঙ্গালার জীবনের ধারায় যে সাধনার গান সমস্ত দেশকে ও দেশের প্রাণকে সজাগ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই কথা কহিব।"

[বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭]

(২) (ক) কত বিচিত্র রূপ, কত বিচিত্র গন্ধ, কত বিচিত্র রস, কত না সুরের খেলা, কত রসের মেলা, - আমরা যে তিলে তিলে নূতন হইয়া উঠিতেছি। বাঙ্গালার কবি তখন চামর ঢুলাইতে ঢুলাইতে গাহিলেন —

নবরে নব নিতুই নব
যখনি হেরি তখনি নব ॥

[বাঁকীপুর অভিভাষণ ১৯১৬]

(খ) "সে নূতনের সাক্ষাৎ মিলিবেই মিলিবে। সে যে "নিতুই নব।" নিজে নূতন হইতেছে। সাথে সাথে এই জাগ্রত বিশ্বও নব নব উন্মেষে মুঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে।"

[বাঁকীপুর অভিভাষণ ১৯১৬]

(গ) "আমার বাঙ্গালার এক চিরন্তন আদর্শ আছে। বাঙ্গালার যেমন শ্যামল-শ্রীরূপ, যেমন সবুজ তৃণের কোমলতা, নীল আকাশ আর গঙ্গার উচ্ছল বারি, আমার বাঙ্গালার আদর্শও তেমনি সেই শ্যামল শ্রী, সেই —

সেই এক আরো বিচিত্র হইবে—আরো বহু হইবে—লীলার কি অন্ত আছে ? চক্ষে যে রূপ দেখি, শ্রবণে যে গান শুনি, তা এই চক্ষু কর্ণের বাহিরে কোন অপরূপ স্বরূপের আভাস আনিয়া দেয়। বাঙ্গালার প্রাণের সেই স্বরূপের খোঁজেই আমি বাহির হইয়াছি। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন বাঙ্গালার প্রাণের সেই স্বরূপের সাক্ষাৎ লাভ করি। সেই স্বরূপের আনন্দঘন বিগ্রহ—আমার শ্যামাঙ্গিনী বাঙ্গালার এই শ্যাম-শ্যামা যেন আমার প্রাণ শতদলের পাপড়িতে পায়ের পাতা রাখিয়া লীলা কল্লোলে তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিতে পারে। বাঙ্গালার প্রাণের এই যে স্বরূপ, তাহার সহিত মুখোমুখী পরিচয় না হইলে,—আত্মায় আত্মায় সে রমণ না হইলে, সৃষ্টি হইবে কি করিয়া, নাদ ফুটিবে কোন্ রন্ধ্র দিয়া, বাঙ্গালার প্রাণের এই স্বরূপের সংস্পর্শে ভিন্ন রসের উপচয় হইবে কি করিয়া, রস না হইলে রূপ ফুটিবে কোন্ পথে, সাহিত্য ও কল্পকলার রূপান্তরই বা হইবে কি প্রকারে ?

কবি সৃষ্টি করিবেন। কিন্তু কবিও অমনি সৃষ্টি করিতে পারেন না। তাঁহার প্রাণে রসের উপচয় হওয়া চাই। সেই রস হইতে রূপের জন্ম কল্পকলার রূপান্তর। কিন্তু স্বরূপের

নবরে নব নিতুই নব
যখনি হেরি তখনি নব ॥
হেরিলে চোখ জুড়াইয়া যায়।"

[বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭]

বিহনে যে রসের সৃষ্টি হয় না। রস না হইলে যে রূপ আসে না। কাজেই স্বরূপের সাক্ষাৎ আগে চাই। কিন্তু সাধন না করিলে ত' স্বরূপের সাক্ষাৎ হয় না। বাঙ্গালার গানে, বাঙ্গালার কল্লকলায় আমি তাই বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপকে আগে খুঁজিয়া বাহির করিতে চাই। কেননা সাধনভ্রষ্ট কবি স্বরূপের সাক্ষাৎ না পাইয়া যে রূপের সৃষ্টি করে তাহা সৃষ্টিই হয় না। সে সৃষ্টি বাঙ্গালীরও হয় না। কাজেই বিশ্বেরও হয় না। তাহা সৃষ্টিকে ভ্যাংচায় মাত্র। বিশ্বে যদি বাঙ্গালীর কোন স্বত্ব স্বামিত্ব থাকে, তবে সে তার বিশিষ্টতার জন্যই। বাঙ্গালীর এই বিশিষ্টতা তার প্রাণের স্বরূপেরই প্রকাশ।

এই বিচিত্র বিশ্বে সকল জাতিরই বৈশিষ্ট্য রক্ষা পাইয়া আসিতেছে। যে জাতির বৈশিষ্ট্য নাই—সে জাতি বাঁচিয়া নাই—অস্তিত্ব থাকিতে পারে। বাঙ্গালী তাহার অতীতের দীর্ঘ ইতিহাসে শুধু এক মৃত অস্তিত্বের ভার বহন করিয়া ফেরে নাই। বাঙ্গালী বিশ্বে এতদিন বাঁচিয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপ হইতে যে সকল রূপের জন্ম হইয়াছে—রূপ বৈচিত্র্যের ধারায়, বাঙ্গালীর শিল্পে, সাহিত্যে ও ধর্ম্ম-কর্ম্মে—বহু বিচিত্র রূপ দেখা দিয়াছে—রস মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে—বিশ্ব তাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে বলিয়াই—সে বিশ্ব হইতে পারিয়াছে। বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করিতে পারে বলিয়াই সে বিশ্ব। তা যদি সে না পারিত তবে সে বিশ্ব হইত না, আর একটা

বিশেষ বা বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপ হইতে অনন্তকাল জন্মিতে পারে বলিয়াই ত, বাঙ্গালার রূপ অনন্ত, আর বাঙ্গালার প্রাণ অমর। বাঙ্গালার এই অনন্ত রূপ ও অমর প্রাণ—বিশ্ব সৃষ্টির—দুর্ব্বার লীলা স্রোতে একটা বৈশিষ্ট্য চিরকাল রক্ষা করিয়া আসিয়াছে বলিয়াই ত আজ বাঙ্গালী তাহার প্রাণের স্বরূপ লইয়া আবার একবার বাঁচিতে চায়। তাহার গানে তাহার কল্পকলার রূপান্তরে তাহাকে আবার একবার ফুটাইয়া দেখিতে ও দেখাইতে চায়।

কিন্তু আজ যে দেশের মেঘ নিংড়াইলে এক ফোঁটা জল বাহির হয় না, সেই দেশে বসিয়া আচম্‌কা এমন এক বিশ্বের নাগাল যদি কেহ পাইয়া থাকেন, যে সেই ধারকরা ফেরঙ্গ বিশ্বের অঞ্জন ব্যতিরেকে আমি আমার মায়ের রূপ দেখিতে পারিব না, এই ফেরঙ্গ বিশ্বের ডাকের গহনায় না সাজাইলে আমার মায়ের রূপ দেখিয়া ফেরঙ্গ-বিশ্ব খুসী হইবে না—অতএব ফেরঙ্গ গাউনে সাজাইয়া মাকে, মাতৃভাষাকে লইয়া ফেরঙ্গ বিশ্বের হাটে ধাও, ধাও। আমি সন্তান, আমি ইহা পারিব না। আমি বাঙ্গালী, আমার সমস্ত অন্তরাত্মা এই কাপুরুষোচিত নির্লজ্জতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

তোমরা বিশ্ব বলিয়া একটা কথা তুলিয়াছ (১), কেন

---

(১) চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের * শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের * সাধনের পথে * * নিজেদের ও দেশের গতিকে লইয়া যাও * * তোমরা নিজেরও পরিচয় পাইবে, দেশেরও পরিচয় পাইবে। ফেরঙ্গ জীবন ও সাহিত্যের এই মহতো ভীতি

তুলিয়াছ তা বুঝিতে পারি। তৈলহীন নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ নিভিবার আগে যেমন একবার জ্বলে—তোমাদের এই জ্বলুনিও তাই। দেওয়ালীর কতকগুলি সবুজ পোকা ইহাতে পুড়িবে মাত্র, কিন্তু জানিও—বাঙ্গালাতে পতঙ্গ ছাড়াও জীব আছে। বিশ্বের অতটা অনুকরণ-চিকীর্ষু ধর্ম্ম সমাজ-সংস্কারের শতবর্ষ-ব্যাপী প্রহসনের উপর যবনিকা পতন হইয়াছে।...তুর্ম্মূল্য

হইতে তবেই রক্ষা পাইবে। স্বধর্ম্মের—বাঙ্গালার প্রাণের এই স্বাভাবিক ধর্ম্মের পরিচয় পাইবে।

"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। নচেৎ সারা বিশ্ব উজাড় করিয়া বিশ্বের কাব্যভার মাথায় করিয়া আনিয়া নিজেদের ও জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া, তাহার স্বাভাবিক সহজ প্রকৃতিগত চিন্তাশক্তি রোধ করিয়া, সত্যের অপলাপ করিয়া মনকে চোখ ঠারিয়া যাহা কিছু রচনা কর না কেন, বেলাভূমে বালুর প্রাসাদের মত এক বন্যায় ধুইয়া মুছিয়া যাইবে, তাহার রেখাও থাকিবে না, কোন চিহ্নও পাইবে না।"

আধুনিক কাব্য সাহিত্যের,—এই খোসপোষাকী কর্পূর সাহিত্যের—এই শূন্য বিশ্বের দিকে উড়িয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত যে বিশ্ব-সাহিত্য—তাহার পৃষ্ঠে কিছু ফুটাইতে পারিয়াছ কি? * * যদি পারিতে, তাহা হইলে * *

শুধু তাহার আকাশ ও বাতাস তোমার প্রাণে বাঁশী বাজাইত না। তাহার প্রাণের রাগিণী তোমার বাঁশরীতে প্রাণময় সুরের রূপ ধরিয়া দেখা দিত। সুরের আবীর হাওয়ায় হানিতে হইত না। তাহার তীব্র বেদনা আকাশ ফাটাইয়া ফুকারিয়া উঠিত। নকল করিয়া এমন নাকাল হইতে হইত না। জীবন আপনি তোমাদের কাছে ধরা দিত। সাহিত্য ও জীবনে কখন ছলনা চলে না। জীবন লইয়া আজ সাহিত্যের বাজারে যে খেলা করিতেছ, এ খেলা নয়; নবযৌবনের দর্পের লীলা নয়; ইহা বিলাতী coquetry, জীবনের সঙ্গে প্রাণের ছলা।

[বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭]

বলিয়া বিশ হাজারে একজন করিয়া বাঙ্গালীরও একশ বছরের মধ্যে এই প্রহসন দেখিবার সুযোগ হয় নাই। আজ অনুকরণ ও প্রহসন যুগের অন্তে রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণের সাধনা ও সিদ্ধিতে আবার বাঙ্গালীর লুপ্ত ধারায় বান ডাকিয়াছে। শাক্ত-বৈষ্ণবের বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য, নবযুগোপযোগী সার্ব্বভৌম সমন্বয় আবার দেখা দিয়াছে। ধর্ম্মের আসরে ইংরাজী বক্তৃতা প্রায় বন্ধ। দক্ষিণেশ্বর ও গেণ্ডারিয়ায়—পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গে আবার আসন হইয়াছিল, গাজনের ঢাক ও সংকীর্ত্তনের মৃদঙ্গ আবার বাজিয়া উঠিতেছে। শাক্ত ও বৈষ্ণবের ধারায় আবার শতদল বিকশিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর গানের ধারায়—আবার তার হারাণো সুর—নব বৈচিত্র্যে নব রূপে দেখা দিবে। আর বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপ হইতেই তাহার জন্ম হইবে। সাধক আসিয়াছিলেন,—সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। এইবার সুর ও রূপ আসিবে—আসিতেছে। (১) তাই তোমাদের এই বিশ্বের প্রলাপে দৃকপাত করিবার অবসর আমাদের নাই।

বাঙ্গালার প্রাণের ধারায় রামপ্রসাদ ও তাঁহার পরবর্ত্তী যুগের কবি-ওয়ালাদের গানের ধারার কথা আমি বলিতে

---

(১) (ক) "আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের কবিতা-মন্দিরে আমি যাহাকে বাঙ্গালা কবিতার প্রাণ বলিলাম, আবার তাহারই প্রতিষ্ঠা হইবে। আমি দেখিব না, কিন্তু সেই গৌরবের আভাস আমার প্রাণকে উজ্জ্বল করিয়া দিতেছে। আমি যেন চক্ষে সব স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। দূরাগত সঙ্গীতের ন্যায় এই মহা মিলন-মন্দিরের ধ্বনি আমার কাণের ভিতর দিয়া প্রাণে প্রাণে প্রবেশ করিতেছে।" (কবিতার কথা)

চাহিয়াছিলাম। (১) পর্ব্বত-বন্ধুর উপল-বিষম ভেদ করিয়া প্রাণের স্বরূপ হইতে যে নদী বাহির হইয়াছে—যাহার তীরে তীরে মন্দিরচূড়া, শ্যাম তরু-বীথির উপর মাথা* জাগাইয়া আকাশ স্পর্শ করিবার স্পর্দ্ধা করিতেছে, যে মন্দিরে বসিয়া চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদ বাঙ্গালার অভেদাত্মক শ্যাম-শ্যামাকে গান শুনাইয়া মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া বাঁধিয়াছে, যে মন্দিরের নিম্নতম

(খ) "তবে বাঙ্গালা জাগিতেছে। দিনের নাগাল পাইবই পাইব। আবার সেই বাঙ্গালা কবিতা শুনিব। সে সাধক আসিবেই আসিবে। আমি যে তাহার আগমনীর সুর শুনিতে পাইতেছি।"

[বাঁকীপুর অভিভাষণ ১৯১৬]

(গ) "অন্ধকার আকাশ, আকাশে তারা নাই, দেশবাসী অসহরূপে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরে তমসাচ্ছন্ন অবসাদ। একদিকে এই অরূপের বিশ্ব-মোহে, তাহার সে জ্ঞান নাই, তাহার ভবিষ্যৎ নাই, অতীত নাই—সব গিয়াছে। সংসার জ্বালাময়! সহজ উচ্ছৃঙ্খল, কোথায় বাঙ্গালার আত্মা! জাগরিত হও, বল—সমস্বরে এই মন্ত্র পাঠ কর, বল এই রূপ আমার, এই প্রাণ আমার। বল আমার অদৃষ্ট আমিই গড়িব, আমার জীবন আমিই গড়িব, আমার সাহিত্য আমিই রচনা করিব। গ্রহনক্ষত্রে জ্যোতিষ্কের দূরাগত পদধ্বনি কাণে আসিতেছে, বাঙ্গালা এ মিথ্যারূপ ত্যাগ করিবেই করিবে। হে বাঙ্গালার সন্তান! মুখ তোল, সত্যকে—জীবনকে মুখোমুখী দেখ, ভাল করিয়া পরিচয় করিয়া লও, দেখ, ওই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছে, বিশ্বাস ও প্রেম বুকের ভিতর, ভবিষ্যৎ আমাদেরই।"

[বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭)

(১) (ক) রামপ্রসাদের পর বাঙ্গালা আবার কিছুদিন গানে ভরিয়া উঠিল। কবিওয়ালাদের গানে বাঙ্গালার পল্লী আবার মুখরিত হইয়া উঠিল। সেই যুগকে বাঙ্গালার গানের যুগ বলা যাইতে পারে।

রামপ্রসাদের মাতৃভাবে বাঙ্গালা মায়ের রূপে দেখা দিলেন। * *

সোপানে দাঁড়াইয়া—তীর্থযাত্রী,—চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের কণ্ঠ শুনিয়া পাগল হইয়া ছুটিয়া যাইতেছে,—সেই ধারা, সেই নদী—আজ যে বাধা পায় পায় পাইতেছে,—তা ঐ শূন্যগর্ভ পর্ব্বতপ্রমাণ বিশ্বকে একখণ্ড শুষ্ক তৃণের মত,—তাহার প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসে ভাসাইয়া লইয়া যাইবেই যাইবে।

নিধুরাম বসু, হরু ঠাকুর, রূপচাঁদ পক্ষী প্রভৃতি কবিওয়ালারা আসিলেন—গানে দেশ তোলপাড় হইয়া গেল। * * সে গানের যুগের অবতার সাধক রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের পূর্ব্বে কিছুদিন যে থামিয়াছিল তাহার পর অবিরাম জলোচ্ছ্বাসের মত গান আসিতে লাগিল * * এই মিঠে ভাষা বাঙ্গালার প্রাণের রাগিণী * *

(বাঁকীপুর অভিভাষণ ১৯১৬)

(খ) বাঙ্গালার কবিতায় চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের যুগে * * তাঁহারা প্রাণের সঙ্গে প্রাণারামের সাক্ষাৎকার না করিয়া কোন কথা কখনও কহেন নাই। * * এই রূপান্তর রামপ্রসাদের হইয়াছিল যখন তিনি সত্য জগন্মাতাকে রূপের লীলায় প্রত্যক্ষ দেখিতেন। বাঙ্গালী জাতির খাঁটি কবি রামপ্রসাদ আর বাঙ্গালী কবির অখাঁটি কবি বা মুসলমানী ধারার কবি ভারতচন্দ্র * * বাঙ্গালার খাঁটি কবি রামপ্রসাদ, ইঁহাকে অবশ্য কেহ বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে ফেলিবেন না।

(বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭)

(গ) বাঙ্গালার অঙ্গনে এই একটা সুন্দর অদ্ভুত ধারা দেখিলাম। যে মুসলমানী ধারার পাশে যেমন রামপ্রসাদ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাঙ্গালার প্রাণের স্রোতকে বহাইয়া লইয়া গেছেন, ঠিক তেমনি রামমোহনের সময়ে কবিওয়ালার দল রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, যজ্ঞেশ্বরী প্রভৃতি বাঙ্গালার খাঁটি কবির দল সেই সুরকে জাগাইয়া রাখিয়াছিল। এই কবিওয়ালাদের গানের যুগের কথা আমি আর একবার বলিতে চেষ্টা করিব। কবিওয়ালাদের শেষ ভাগে ঈশ্বর গুপ্তের যে হাস্য রস্ তাহার কথাও কহিব।

(বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭)

"বিশ্ব" আজ বাঙ্গালার প্রাণের ধারায়, গানের ধারায় বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালার গানে যদি বাঙ্গালীর প্রাণ থাকে,—তবে একথা আমি বিশ্বাস করি যে, বাঙ্গালীর প্রাণের ধারায় পাষাণ "বিশ্ব" টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইবে,—বাঙ্গালীর গানে বিশ্ব ডুবিবে। পথের বাধা দূর না করিয়া বাঙ্গালী অগ্রসর হইবে কিরূপে ?

"বিশ্ব" সাজিবার "বিশ্ব" সাহিত্য রচিবার কথা মুখে আন কি করিয়া—আমি বুঝিতে পারি না। পৃথিবীর জাতি সকলের উত্থানে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে অক্ষম,—'বিশ্ব' নাম মুখে আনিতে তোমাদের লজ্জা হয় না! ফরাসী, জার্ম্মান, রুষ, বেলজিয়ম, নরওয়ে, সুইডেন—এই সমস্ত জাতির গত ২৫।৩০ বৎসরের একটা রঙীন ফেনিল মাদকতাপূর্ণ সাহিত্যের যে খেলো ইংরাজী তর্জ্জমায় রস-বৈচিত্র্যের ধাঁচা নকল করিয়া, ফেরঙ্গ খোসায় দেশী ও বিদেশী প্রাণের যে জগা খিচুড়ী দেশ বিদেশে পরিবেষণ করিতে ধাবিত হইয়াছ—ইহা কি, কেন সৃষ্টি হইয়াছে ? ভাবিয়াছ—ইহার বুঝি কোনদিন কোন বিচার হইবে না ? এই অদ্ভুত বিসদৃশ সুর ও রূপের একত্র সমাবেশ, যাহাতে রসাঙ্গসমূহ অঙ্গাঙ্গীভাবে—একত্রীভূত ও একাত্ম হয় নাই—হইতে পারেও না,—যাহা,—না এ—না ও—দুইয়ের বার ; তাহাই লইয়া ফেরঙ্গের হাটে কোন্ অধম বিদূষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে ? যাদুকর ভালুকের গলায় দড়ি বাঁধিয়া তুড়ি দিয়া দিয়া তাহাকে নাচায়। এ যুগের বাঙ্গালা

সাহিত্যের গলায় সেই ফাঁসির সূত্র ধরিয়া আছে ঐ ফেরঙ্গ বিশ্ব, ফেরঙ্গ-বিশ্বের হাতের তুড়িতে বাঙ্গালা সাহিত্যের নব যৌবনের দলের যে ভালুক-নাচ তাহা আজকার বাঙ্গালাতেই সম্ভব। কেন না বাঙ্গালার কেশরী জানি না কোন্ গহনে আজ গা ঢাকা দিয়াছে, তাই আজ সিংহের বিচরণ-ভূমিতে গলায় ফেরঙ্গ ফাঁস বাঁধা অধম ভালুকের নাচ দেখিতে হইতেছে।

লজ্জা হয় না মুখে 'বিশ্ব' নাম উচ্চারণ করিতে? বিশ্বের ধূয়া ধরিয়া—যে পাশ্চাত্যের ঘরে সিঁধ কাটিতে চাও,—বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার নকল করিয়া এত মতে হাত মক্স কর, আমি বলি কি একবার—

মশারি তুলিয়া দেখরে আপন মুখ।

পাশ্চাত্যের এই জাল মশারি তুলিয়া একবার আপনার মুখ দেখ, নইলে—

তুমি পরের ঘরের হিসাব কর,
তোমার আপন ঘরে যায় যে চুরি।

বিশ্ব ও বিশ্ব-সাহিত্য লইয়া যে এত মাতামাতি করিতেছ, বুঝি মনে করিয়াছ, বাঙ্গালী কোন জন্মে বিশ্ব বলিতে কি বুঝায় তাহা জানে না?

স্থূল শরীর-ব্যষ্ট্যুপহিতং চৈতন্যং—অর্থাৎ এই ব্যষ্টি বা পৃথক্ পৃথক্ শরীরে উপহিত চৈতন্য বিশ্ব নামে অভিহিত হয়। আর—

এতৎ সমষ্ট্যুপহিতং চৈতন্যং—অর্থাৎ এই স্থূল শরীর সমূহের সমষ্টিতে যে চৈতন্য উপস্থিত হইয়াছেন, তিনিই বৈশ্বানর ও বিরাট।

যে বাঙ্গালী সাধনের দ্বারা জানিয়াছে যে "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ"—

যে বাঙ্গালী গাহিয়াছে—

শোন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে
মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই—

বলিতে চাও, সেই বাঙ্গালী তাহার জীবনের সাধনায়, তাহার কল্পকলায়, তাহার গানের রূপান্তরে বিশ্বের দেখা পায় নাই? যে দেশের জল বায়ুতে এই তত্ত্ব মিশিয়া রহিয়াছে যে—"যত্র জীব তত্র শিব"—"শিব শক্তি অভেদ"—

যে বাঙ্গালী "কালো মেঘ উদয় হল অন্তর অম্বরে" দেখিয়া গাহিয়াছে—

"মা আমার অন্তরে আছ,
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা—"

বলিতে চাও, সেই বাঙ্গালীর বিশ্ব দেখা হয় নাই? দেব বৈশ্বানর একবার প্রজ্বলিত হও। তপোবনের আবর্জ্জনা, শুষ্ক তৃণ পল্লব বাতাসে মর মর করিতেছে, একবার তোমার পবিত্র দাহনে সমস্ত কলুষ ভস্মীভূত কর।

২

রামপ্রসাদের পর হইতেই বাঙ্গালীর এই মায়ের রূপ বাঙ্গালীর চক্ষু হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। মায়ের এই প্রতিমা

আবার মন্দিরে মন্দিরে গড়িবার আয়োজন হইয়াছে। "সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং" যে মাতা, তাঁর রূপ ধ্যান আবার কল্পিত হইয়াছে। সমগ্র বাঙ্গালা দেশের প্রাণে যখন স্বদেশীর এক নূতন জোয়ার আসিয়াছিল, তখন সেই প্রলয় পয়োধিজলে, —মায়ের

"ডান হাতেতে খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ ;
তাঁর দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাট নেত্র অগ্নিবরণ"—

এই রূপও অন্ধকারে তড়িৎ শিখায় একদিন উদ্ভাসিত হইয়া গিয়াছে। তথাপি এই নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের মাতৃমূর্ত্তি, আর রামপ্রসাদের মাতৃমূর্ত্তির ভাব ও রূপে পার্থক্য আছে। এই দুই কিছুতেই এক বস্তু নয়। পঞ্চমুণ্ডীর আসনে, ধ্যানস্তিমিত-লোচন সাধকের অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপ হইতে, বাঙ্গালীর মায়ের যে রূপ একদিন দেখা দিয়াছিল—

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে
গলিত চিকুর আসব আবেশে
কে রে নীলকমল, শ্রীমুখমণ্ডল
অর্দ্ধ চন্দ্র ভালে প্রকাশে—

এ কার রূপ ? এই ত বাঙ্গালার প্রাণের রূপ ; —এই ত বাঙ্গালীর মায়ের রূপ।

কোটী চন্দ্র ঝলকত, শ্রীমুখমণ্ডল নবনীলনীরদতনু-রুচিকে,—

কে রে,—নব নীল জলধর কায়, হায় হায়—
কে রে নির্জ্জনে বসিয়া নির্ম্মাণ করিল।
পদ, রক্তোৎপল জিনি
তবে কেন রসাতলে যায় ধরণী!

রামপ্রসাদ বলে আমার মায়ের রক্তপদ্মজিনি এই চরণ যুগল কোন্ বিশ্ব-শিল্পী নির্জ্জনে বসিয়া নির্ম্মাণ করিল? আমার মায়ের এমন চরণ থাকিতে ধরণী রসাতলে যায় কেন?

বাঙ্গালার প্রাণের এই এক রূপ, বাঙ্গালীর গানে এই এক সুর। রামপ্রসাদ বাঙ্গালার সাধনায় ও কলায় এই রূপের রূপান্তর ঘটাইতে পারিয়াছেন।

বাঙ্গালার আর এক রূপের কথা আপনাদিগকে আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি (১)। সেই

থির বিজরী বরণ গৌরী
চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর!

এই রূপের সাধনায়, জীবনে ও কাব্যে রূপান্তর ঘটাইয়াছিলেন চণ্ডীদাস।

(১) "চম্পক-বরণী, হরিণ নয়নী * *
চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ী নিঙ্গাড়ী
পরাণ সহিত মোর।"

—ইহাই বাঙ্গালা গীতি কবিতার প্রাণ। (বাঁকীপুর, খৃঃ ১৯১৬)। সম্প্রতি কেহ কেহ বলিতেছেন এইটি চণ্ডীদাসের পদ নয়। পরন্তু রামগোপাল দাসের রচিত।—সম্পাদক।

বাঙ্গালার গানে এই দুই রূপেরই রূপান্তর হইয়াছে। এই দুই রূপই এক বাঙ্গালার প্রাণ হইতেই জন্মিয়াছে। শাক্ত ও বৈষ্ণব—একই প্রাণের রস-বৈচিত্র্যের রূপ-বৈচিত্র্য মাত্র। একই প্রাণের স্বরূপ হইতে ইহাদের জনম বলিয়া—ইহারা অভেদাত্মক। চণ্ডীদাস বাঙ্গালার কান্তভাব লইয়া তাঁহার কাব্যের রূপান্তরে তাহাকে ভাগবত সত্যে উপনীত করিয়াছেন। রামপ্রসাদ বাঙ্গালার মাতৃভাব লইয়া তাহাকেও কাব্যের সেই শেষ পরিণতিতে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন !

প্রসাদ বলে, 'মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে, সে ভাব লোভে পরম যোগী, যোগ করে যুগ যুগান্তরে।'

বাঙ্গালার গীতি কবিতার ইতিহাসে—বৈষ্ণব কবিতার যেমন একটি ধারা বহিয়া গিয়াছে—শাক্ত কবিতারও তেমনই একটা ধারা প্রবাহিত আছে। বৈষ্ণব গীতি কবিতার ধারার কথা আমি বলিয়াছি (১), শাক্ত কবিতার ধারাও আমি ইঙ্গিত করিয়াছিলাম (২), হয়ত পরিষ্কাররূপে বলিতে পারি নাই। রামপ্রসাদ মাতৃভাবে তত্ত্ব করিয়া যাহাকে মনোযন্ত্রে বাদ্য করিয়া হৃদিপদ্মে নাচাইয়া গিয়াছেন, যে এলোকেশীকে

(১) মুন্সীগঞ্জ—১৯১৪ খৃঃ। বাঁকীপুর, ১৯১৬ খৃঃ। বগুড়া, ১৯১৭ খৃঃ।

(২) "সেই অন্ধকারের মধ্যেই রামপ্রসাদ আসিলেন। কিন্তু তাহার মধ্যে আবার মুকুন্দরাম, কাশীরাম, ঘনরাম, রামেশ্বর বাঙ্গালার কাব্যের ধারাকে অন্যদিকে পুষ্ট করিয়াছিলেন। * *

রামপ্রসাদের কালী কীর্ত্তন ও রামপ্রসাদের যে গান তাহার তুলনা হয় না। * * বাঙ্গালী জাতির খাঁটি কবি রামপ্রসাদ। * *

হৃদয়ে ধরিয়া "গয়া গঙ্গা কাশী" বৃথা মনে করিয়াছেন,—ভক্তি পথের সাধক হইয়া সেই ষড়-দর্শনের "অন্ধগুলা"কে গালি দিয়া শুধু তর্ক দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণের কথা "দেঁতোর হাসি" বলিয়া উপহাস করিয়াছেন, পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসিয়া—"মা বিরাজেন সর্ব্বঘটে"—এই বিশ্বতত্ত্ব তার-স্বরে রটিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী হইয়া নিজেকে "ব্রহ্মময়ীর ব্যাটা" জ্ঞানে ব্রহ্মাণ্ডকে গোষ্পদ তুল্য ভাবিয়া ভ্রূক্ষেপ করেন নাই,—"মায়াতীত নিজে মায়া উপাসনা হেতু কায়া"—"সেই তিমিরে তিমির হরা" ব্রহ্মময়ী মাকে আজ বাঙ্গালার "অন্ধ আঁখি" দেখিতে পায়না সত্য, —কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের অতীতের দুই তিন শতাব্দীর অন্ধকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখা যাইবে যে, রামপ্রসাদের এই—

"ঢল ঢল জলদবরণী,"—

এই—"শোভিত শোণিত ধারা মেঘে সৌদামিনী—" বাঙ্গালীর কত দিনের কত যুগের আঁধার অতীতকে আলো

* * তাহার পর রামপ্রসাদের গান আমরা কয়ভাগে ভাগ করিতে পারি। কালী কীর্ত্তন, শিব সঙ্গীত, কৃষ্ণ সঙ্গীত ও তত্ত্ব সঙ্গীত। রামপ্রসাদ তাহা ছাড়া বিদ্যাসুন্দর ও অন্যান্য অনেক রচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার গীতি কবিতার এই দ্বিতীয় পল্লবে আমরা রামপ্রসাদের যুগের সঙ্গে পরিচিত হইতে চেষ্টা করিব। আজু গোঁসাই, রামদুলাল, কমলাকান্ত প্রভৃতি সকলেই রামপ্রসাদকেই অনুসরণ করিয়াছেন।"

(বগুড়া, ১৯১৭ খৃঃ)

করিয়া আছে। রামপ্রসাদের অতীতের তিন তিনটি (১) শতাব্দীর যবনিকা একে একে উত্তোলন করিলে দেখা যাইবে—সে দিনের বাঙ্গালী কবির ধ্যানে—এই মাতৃমূর্ত্তি কিরূপে প্রকট হইয়াছিল—

—ভৈরবী ভীমা লোচন বিশাল।
কাতি খর্পর হাতে, গলে মুণ্ডমাল॥
হাম হাম করিয়া আমার ধরে কেশ।
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে ভয়ঙ্কর বেশ॥

১। কবি কঙ্কণের জন্মতারিখ নির্দ্দিষ্ট নাই। ১৫৩৭ খৃঃ দীনেশ বাবু কবিকঙ্কণের জন্মতারিখ অনুমান করিয়াছেন। ১৫৭৫ খৃঃ কবিকঙ্কণ তাঁহার গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়া ১১।১২ বৎসরে তাহা সম্পূর্ণ করেন। সেই সময় মানসিংহ বঙ্গ দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।—সম্পাদক।

"ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজে ভৃঙ্গ, গৌর বঙ্গ উৎকল অধিপ। অধর্ম্মী রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে খিলাৎ পায় মানুদ সরিফ।" * *

* * "শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা। সেইকালে দিলা গীত হরের বনিতা॥" অর্থাৎ ১৫৫৭ খৃঃ চণ্ডী আদেশ দিলেন। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ডাঃ দীনেশ সেন)

১৭৫৯ খৃঃ রামপ্রসাদ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে গান শুনাইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে সিরাজউদ্দৌলাকেও রামপ্রসাদ গান শুনাইয়াছিলেন। সুতরাং তাহা পলাশী যুদ্ধের অর্থাৎ ১৭৫৭ খৃঃ পূর্ব্বে হইবে।

কবিকঙ্কণের কাব্য সৃষ্টি হইতে (১৫৮৯ খৃঃ) রামপ্রসাদের কাব্য সৃষ্টি (১৭৫৯ খৃঃ) মধ্যে ১৭০ বৎসর কাল আমরা পাই। পুরা দুই শতাব্দীও নহে।

তবে যে এখানে তিনটি শতাব্দী লেখা হইয়াছে তাহা ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ এইরূপ তিনটি শতাব্দী গণনায় হইবে। নতুবা বৎসর গণনায় ইহা তিন শতাব্দী অর্থে ৩০০ বৎসর হইতে পারে না। ১৭০ বৎসর বা ইহার কাছাকাছি হইতে পারে।—সম্পাদক।

পিঠে লম্ববান তার শোভে জটাভার।
শঙ্খের কুণ্ডল কানে ভীষণ আকার॥
পরিধান সবাকার লোহিত বসন।
বাকসনা কুল যেন ছুপাটি দশন॥
বিভূতি ভূষণ শোভে সবাকার গায়।
চৌদিকে যোগিনীগণ নাচিয়া বেড়ায়॥
গজ ঘোড়া কাটি পীয়ে রুধিরের পানা।
নাচায়ে অবনি তলে প্রেত ভূত দানা॥
মড়ার আতড়ী কেহ করিয়া উত্তরী।
অঙ্গুলীতে আরোপণ কেশ কুশাঙ্গুরী॥
তিলক করয়ে দানা হাড়ের চন্দনে।
তর্পণ করেন নব কপাল ভাজনে॥

কবিকঙ্কণের এই স্বপ্ন—বাঙ্গালীর সাহিত্যের ধারার যে স্মৃতিকে বহন করিয়া আনিয়াছে—একদিন রামপ্রসাদের গানে তাহারই চরম বিকাশ আমরা দেখিয়াছি। কবিকঙ্কণ গীত রচনা করেন নাই, কাজেই গীতি কবিতার ধারায় তাঁহার কাব্যের আলোচনা আমি করিব না। চণ্ডীর উপাখ্যান ব্রত লইয়া যে সমস্ত বাঙ্গালী কবি কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহাদের মধ্যে মুকুন্দরামের নিকট কাহার ঋণ কত, তাহার পরিমাণ না করিয়া শুধু এই মাত্র বলিব যে, মুকুন্দরামের কবি প্রতিভায় বাঙ্গালীর গৃহস্থালী বাঙ্গালীর সমাজ—বাঙ্গালীর-চরিত্র বিশ্লেষণ—এক কথায় বাঙ্গালার রূপ ও রস যেরূপ

নিখুঁত অঙ্কিত হইয়াছে—আর কোন কবির তুলিকা সেই অসাধ্য সাধন করিতে পারে নাই। গীতি কবিতার না হইলেও মুকুন্দরাম শাক্ত সাহিত্যের একজন প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাসম্পন্ন কবি (১) শাক্ত সাহিত্যের গীতি কবিতার ধারার সহিত মুকুন্দরামের এই সৃষ্টি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

---

(১) পরলোকগত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন,—'কবিকঙ্কণ নিঃসংশয়রূপে বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রধান কবি। কি মানব স্বভাব পরিজ্ঞান, কি বাহ্য জগদ্বর্ণনানৈপুণ্য, কি করুণ রসের উদ্দীপনা শক্তি, কি সুকল্পনা, সকল বিষয়েই তিনি অদ্বিতীয়। যদি তাঁহার মানবস্বভাব পরিজ্ঞানের বিশেষ দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও তবে যে স্থলে অঙ্গুরীয় ভাঙ্গাইবার জন্য বণিকের নিকট কালকেতুর গমন বর্ণিত আছে, সেই স্থান পাঠ কর। যদি তাঁহার বাহ্য জগদ্বর্ণনানৈপুণ্য বিশেষরূপে দেখিতে চাও, তবে তাঁহার বর্ণিত কলিঙ্গায় ঝড় বৃষ্টির বর্ণন ও মগরায়ও ঐ ঘটনার বর্ণন পাঠ কর। যদি তাঁহার করুণ রস উদ্দীপনা শক্তির বিশেষ পরিচয় পাইতে চাও, তবে ধনপতির কারা মোচন কালে আক্ষেপ উক্তি পাঠ কর। যদি এই তিন গুণের একত্র মিশ্রণ দেখিতে চাও, তবে কালীদহের কমলে কামিনী কর্ত্তৃক করিগ্রাস ও উদ্গীরণ ব্যাপার বর্ণন এবং যে স্থানে পাত্রমিত্র সভাসদ্ লইয়া পশুরাজ সিংহের বার দিয়া বসা বর্ণিত আছে, সেই স্থান পাঠ কর। এই দুই স্থলে মুকুন্দরাম সুকল্পনা শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশেষতঃ প্রতিভা বিষয়ে তিনি বাঙ্গালা ভাষার অদ্বিতীয় কবি। ভারতচন্দ্র তাঁহার অনেক স্থলে অনুকরণ করিয়াছেন। অনেক স্থলে ভারতচন্দ্র কবিকঙ্কণের ছায়ামাত্র। * * ভারতচন্দ্রের অনেক স্থানের ভাব পারসী ও সংস্কৃত হইতে নীত। এসিয়া বা ইয়োরোপ খণ্ডের এমন কোন কবি নাই যে, তাঁহাকে মাইকেল মধুসূদন অনুকরণ করেন নাই। স্বকপোল রচনা শক্তি বিষয়ে মোটা ধুতি ও উড়ানি পরিধানকারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সুসভ্য সভাসদ্ ভারতচন্দ্র এবং কোট পেণ্টালুন পরিধানকারী মাইকেল মধুসূদন—কে জিতিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কবিকঙ্কণের দুইটি মনোহর লক্ষণ

শাক্ত সাহিত্যের ধারা অনুসরণ করিতে করিতে হঠাৎ বাঙ্গালার এক অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্ম ও সমাজ বিপ্লবের ইতিহাস আপনা হইতেই তাহার বিচিত্র অধ্যায়গুলি মনশ্চক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরে। আমরা ভুলিতে পারি না, বাঙ্গালী একদিন বৌদ্ধ হইয়াছিল (১)। কে জানে কত শত বৎসর ধরিয়া সমগ্র জাতি জগদ্‌গুরু বুদ্ধের ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের আশ্রয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিয়াছিল! তার পর সমস্ত জাতি যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের জীর্ণ খোলস পরিত্যাগ করিবার জন্য পাশ ফিরিতে লাগিল, তখন সেই আলোড়নের দিনের ইতিহাস খুঁজিবার জন্য মন্দির, মঠ, এমন কি মসজিদেও প্রত্নতত্ত্ববিৎকে যে বহুবার আনাগোনা করিতে হইবে, তাহা নিশ্চিত। এবং বাঙ্গালার সাহিত্যের ধারা যিনি অন্বেষণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাকেও ঐ বিলুপ্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহিমাজ্ঞাপক বহু ধ্বংসাবশেষ পরবর্ত্তী

এই যে, তিনি নিজে দরিদ্র ছিলেন, দরিদ্র জীবন যেমন তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, অন্য কোন কবি সেরূপ করিতে পারেন নাই। 'দরিদ্র কবি' এই গৌরবাস্পদ উপাধি যেমন তিনি প্রাপ্ত হইতে পারেন, তেমন অন্য কোন কবি প্রাপ্ত হইতে পারেন না।"

[বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, পৃঃ ১৩-১৫]

৺রাজনারায়ণ বসুর মতে—ভারতচন্দ্র কবিকঙ্কণকে অনুকরণ করিয়াছেন। ৺চিত্তরঞ্জন বলিতেছেন—রামপ্রসাদ কবিকঙ্কণের কালীর ধ্যানকে চরম পরিণতিতে লইয়া গিয়াছেন। ইহা নূতন কথা। অপর কেহ বলেন নাই। সম্পাদক।

(1) More than three-fourths of the population of Bengal were Budhist. (Page 3)

—Introduction by Pandit H. P. Sastri to Modern Budhism by Nagendranath Basu.

বৈষ্ণব ও শাক্ত সাহিত্যে যে স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে তাহাও অকুতোভয়ে স্বীকার করিতে হইবে।

"ধর্ম্মমঙ্গল" কাব্যগুলি ঠিক গীত বলা যাইতে পারে কিনা বিশেষজ্ঞরা তাহার সমাধান করিবেন। বৌদ্ধ যুগের পরবর্ত্তী বাঙ্গালার বৈষ্ণব ও শাক্ত সাহিত্য যেরূপ স্বাতন্ত্র্য-গরিমায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল—বৌদ্ধ সাহিত্যের সেরূপ কোন উজ্জ্বল স্বতন্ত্র ধারা এখন আর আমাদের চক্ষে পড়ে না। (১) সে শ্রমণ

(১) "বুদ্ধদেবের একটি সামান্য বন্দনাও প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে নাই। * * *

"এমন কি পালী ও প্রাকৃতের দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত দেখিয়া খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণ পণ্ডিত তদীয় 'প্রাকৃত চন্দ্রিকায়' বঙ্গ ভাষাকে পৈশাচিক প্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।"

"যে দেশের প্রিয়পুত্র বৌদ্ধাচার্য্য শান্ত রক্ষিত নালন্দা বিহারের শ্রেষ্ঠতম অধ্যাপকের আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সমস্ত বৌদ্ধ জগতে অনন্যসাধারণ বঙ্গীয় প্রতিভার গৌরব প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, সেই দেশ হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানে বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম্মের প্রতি এতাদৃশ প্রতিকুলতা অবলম্বন করিল যে, তাহার সাহিত্যে উক্ত ধর্ম্ম প্রসঙ্গের জন্য কণিকা মাত্র স্থানও ছাড়িয়া দিতে কুণ্ঠিত হইল।" * *

"অনেকগুলি বৌদ্ধ সংক্রান্ত পুথি বঙ্গদেশীয় লেখকগণ ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে লিখিয়াছিলেন। সেগুলি নানাস্থানে পাওয়া গিয়াছে। চূড়ামণি দাস, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব লেখকগণ কৃষ্ণদাস কবিরাজের ন্যায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন উপলক্ষে প্রসঙ্গক্রমে বৌদ্ধগণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্যের সময়ে সপ্তগ্রাম নিবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ সুবর্ণ বণিক বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধে এই আপত্তি উত্থাপন করেন যে, যখন সমস্ত জগত দুঃখসাগরে মগ্ন, তখন তিনি নিজে উদ্ধার কামনা করিতে পারেন না। একথা বৌদ্ধদিগের, প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে বৌদ্ধ প্রভাবের পরিচয় আছে।"

* * * *

নাই, সে বৌদ্ধ বিহার নাই, মঠ নাই,—মন্দির মসজিদে তাহা আত্মগোপন করিয়াছে। বর্ণাশ্রমকে সমভূম করিয়া বৌদ্ধের সাম্যমূলক যে সমাজ-বিন্যাস, তাহার কোন চিহ্নই ত বাঙ্গালা আজ দেখাইতে পারে না। পরবর্ত্তীকালে নব্য হিন্দুর পুনরুত্থান-

"ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে দৃষ্ট হয়, রামাই পণ্ডিত মহারাজ ধর্ম্মপালের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। রামাই পণ্ডিতকৃত ধর্ম্ম-পূজা পদ্ধতি পাওয়া গিয়াছে ও ইহা 'শূন্যপুরাণ' নামে পরিচিত। তন্মধ্যে অনেক কথায়ই বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিষ্কার আভাস আছে, যথা:—"ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে" (নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহশ্রুতিজাতম্), "শ্রীধর্ম্মদেবতা সিংহলে বহুত সম্মান", এতদ্ব্যতীত রামাই পণ্ডিতোক্ত শূন্যবাদও বৌদ্ধধর্ম্মেরই কথা। পরবর্ত্তী কতকগুলি ধর্ম্মমঙ্গলে মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি কয়েকজন বৌদ্ধ মহান্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।"

* * * *

"পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থগুলিতে আমরা ক্রমশঃ বৌদ্ধভাবের বিলয় ও চণ্ডীর মাহাত্ম্যের কীর্ত্তন দেখিতে পাই।"

* * *

"বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদ শুধু রামাই পণ্ডিতের পুঁথিতে নহে, অপরাপর বাঙ্গালা পুঁথিতেও দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় একখানি প্রাচীন বিদ্যাসুন্দরের হস্তলিখিত পুঁথি হইতেও সম্প্রতি ঐরূপ শূন্যবাদের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন।"

* * *

"চৈতন্য ভাগবতে উল্লিখিত আছে—"যোগীপাল গোপীলাল মহীপাল গীত। ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত।"

(১) শূন্যপুরাণ—

(২) কানুভট্ট বিরচিত চৌর্য্যাচৌর্য্য বিনিশ্চয়।

(৩) মাণিকচাঁদের গান।

* * *

যুগের এক বিষম ভেদমূলক জাতিবিভাগের সমাজ বিন্যাস আমরা পাইলাম। সে বর্ণাশ্রম আর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিল না,—সে বৌদ্ধের সাম্যবাদও রহিল না। তাই পরবর্ত্তী বাঙ্গালা সাহিত্যে শাক্ত বৈষ্ণবের ধারায়, বৌদ্ধ সাহিত্যের

"In 1042, the famous Atish, native of Bengal, came to Tibbet. He wrote a great number of works which may be found in the Bastanhgyur and translated many others relating principally to Tantrik theories and practices."

Rockhill's Life of Buddha. P 227.

'ইতিহাসে পাওয়া যায়, প্রসিদ্ধ অতীশ (দীপঙ্কর) একাদশ শতাব্দীতে তন্ত্র মন্ত্রাদির চর্চ্চায় নিযুক্ত ছিলেন,—বৌদ্ধগণ শেষ সময়ে তান্ত্রিক অনুষ্ঠান অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই তন্ত্রমন্ত্রের প্রভাব মাণিকচাঁদের ও গোবিন্দচন্দ্রের গানে বিশেষ দৃষ্ট হইবে। হাড়ি সিদ্ধা ইন্দ্রকে ডাকিয়া—পথ প্রস্তুত করিতেছেন, অপ্সরাদিগকে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে আদেশ দিতেছেন, অথচ তিনি জাতিতে চণ্ডাল।"

* * * *

গোবিন্দচন্দ্র রাজার গান।

ডাক ও খনার বচন।

ময়নামতীর গান।

গোরক্ষ বিজয়।

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন)

* * * *

ডাক্তার গ্রীয়ারসন সাহেবের প্রচারিত "ময়নামতীর গান," দুর্ল্লভ মল্লিক বিরচিত "গোবিন্দচন্দ্রের গীত," শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর মহাশয় সংগৃহীত "ময়নামতীর গাথা," ভবানী দাস রচিত "ময়নামতীর পুঁথি," আবদুল সুকুর মোহাম্মদ কৃত "ময়নামতীর গান," সহদেব চক্রবর্ত্তীর "ধর্ম্মমঙ্গল," শ্যামদাস সেনের "মীনচেতন," এবং এই "গোরক্ষ বিজয়," একই শ্রেণীর গ্রন্থ। রামাই পণ্ডিতের "শূন্য পুরাণ"কেও কতকটা এই শ্রেণীর অন্তর্গত করা যাইতে পারে। এই সব প্রত্যেক গ্রন্থই নাথ ধর্ম্মের ও ধর্ম্ম

স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা পায় নাই। যেমন মন্দিরে মসজিদে বৌদ্ধ মঠ লুকাইয়া আছে, ভেদবাদী সমাজ-বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ও শাক্তের সাম্যমূলক সমাজগঠনের আদর্শ আছে, তেমনি বৌদ্ধ যুগের পরবর্ত্তী শাক্ত ও বৈষ্ণবের সাহিত্যে বৌদ্ধ

পূজার প্রসঙ্গ লইয়া বিরচিত হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যেকেরই সহিত প্রত্যেকের অল্পবিস্তর সম্পর্ক বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। "ময়নামতীর গান" শুনিতে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনীর সঙ্গে গোরক্ষনাথ ও হাড়িকার প্রসঙ্গ দেখা যায়। "গোরক্ষ বিজয়ে" মীননাথের পতন ও শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্ত্তৃক তাহার পুনরুদ্ধার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ইহা নাথধর্ম্মের একখানি প্রধান উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইহা হইতে বাঙ্গালার তৎকালীন সমাজ, ধর্ম্ম, ভাষা ও ইতিহাসের অনেক কথা জানিতে পারা যায়।"

[p. 2-3 গোরক্ষ বিজয় by আবদুল করিম।]

"বাঙ্গালার গীতিকাব্য যে কখন কোন আদিম ঊষায় ফুটিতে আরম্ভ করিল, আমি জানি না। শুনিয়াছি, সন্ধ্যাভাষায় লিখিত পুরাতন বৌদ্ধ দোঁহায় তাহার উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়।"

[মুন্সীগঞ্জ, ১৯১৪ খৃঃ]

"আমার মনে হয়, যে ওই সন্ধা-ভাষার বৌদ্ধ সহজিয়ার পদ হইতে চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা পদের মধ্যে কালের বিপুল প্রভাব আছে; অনেক ভাঙ্গা গড়ার ভিতর দিয়া না যাইলে ভাষার ছাঁদ ও রীতি যাহা চণ্ডীদাসে ফুটিয়াছে, তাহা হইতেই পারে না।"

[বগুড়া, ১৯১৭ খৃঃ]

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে বৌদ্ধ সাহিত্যের ধারা ধারাবাহিকরূপে এ পর্য্যন্ত কেহই আলোচনা করেন নাই। বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারা যে ভাবে আলোচিত হইয়াছে বৌদ্ধ সাহিত্যের ধারা নিশ্চয়ই সে ভাবে আলোচিত হয় নাই। 'ধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যগুলি বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনেক চিহ্নই ধারণ করিয়া আছে। প্রথম 'ধর্ম্মমঙ্গল' কবে রচিত হইয়াছিল তাহা ঠিক না জানিতে পারিলেও অধুনা আবিষ্কৃত প্রায় সবগুলি

সাহিত্যের লুপ্তপ্রায় ধারা লুক্কায়িত আছে। "ধর্ম্মমঙ্গল" কাব্যগুলি বৌদ্ধ সাহিত্যে লুপ্তধারার দুই একটি ফেনা মাত্র। পরবর্ত্তীকালে রূপান্তরে কি করিয়া ঐ লুপ্তধারা বৈষ্ণব ও শাক্ত সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছে, তাহা একদিন অবশ্যই কেহ অন্ধকার হইতে তুলিয়া দেখাইবেন। "ধর্ম্মমঙ্গল" কাব্যের ধারার সর্ব্বশেষ কবি সহদেব চক্রবর্ত্তী (১) কিরূপে ক্রমে কাব্যের বিষয়গুলি বৌদ্ধের "ধর্ম্মঠাকুর" হইতে হিন্দুর দেব দেবীতে রূপান্তরিত করিয়াছেন তা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই কাব্যে—

"শরণ লইনু, জগত জননী ও রাঙ্গা চরণে তোর
ভব জলধিতে অনুকূল হইতে, কে আর আছয়ে মোর ?

'ধর্ম্মমঙ্গলই' খুব অল্পদিনের মধ্যে যে লেখা হইয়াছে, তা সকলেই জানেন। ১৭শ শতাব্দীর শেষ ২৫।৩০ বৎসরে আর ১৮শ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধ অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের অল্প কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—'ধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যগুলির যুগ—অবিসম্বাদিতরূপে নির্দ্দেশ করা যায়। এই কালের মধ্যে হঠাৎ এই কাব্যগুলি পর পর কেন দেখা দিল তা আমরা এখন পর্য্যন্ত ভাবিয়া দেখি নাই। তবে কি বৈষ্ণব ধারার পরে শাক্ত ধারার পুনরুত্থানের পূর্ব্বে আবার নব বৌদ্ধ ধারার পুনরভ্যুত্থান হইয়াছিল? দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই বিস্তৃত বৌদ্ধ ধারার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। আশা, কেহ কালে এই ধারা ধরিয়া গবেষণা করিবেন, করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসকে পরিপুষ্ট করিবেন।—সম্পাদক।

(১) "সহদেব চক্রবর্ত্তী হুগলী জেলার বালীগড় পরগণাধীন রাধানগর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৭৪০ খৃঃ ৪ঠা চৈত্র কালুরায় নামক দেবতার স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়া 'ধর্ম্মমঙ্গল' রচনা আরম্ভ করেন।"—(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ডাঃ দীনেশ সেন)— [১৭৩৫ খৃঃ হইবে। ১৭৪০ খৃঃ গণনায় ভুল হয়।—সম্পাদক।]

দুগ্ধকণ্ঠ শিশু, দোষ করে রোষ না করয়ে মায়।
যদি বা রুষিবে পড়িয়া কাঁদিব, ধরিয়া ও রাঙ্গা পায়॥
হরি-হর ব্রহ্মা ও পদ পূজয়ে, তাহে কি বলিব আমি।
বিপদ সাগরে—তনয় ফুকারে, বুঝিয়া যা কর তুমি॥"

সহদেবের ধর্ম্মমঙ্গলের এই সরল প্রাণস্পর্শী ভাষায় যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকেই কি আমরা রামপ্রসাদের কাব্যের রূপান্তরের পূর্ব্বাভাস বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি না? বৌদ্ধ সাহিত্য কি করিয়া কালে শাক্ত সাহিত্যে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে, ইহা কি তাহারই একটা দৃষ্টান্ত নয়? (১)

শিবের প্রসঙ্গ লইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে যে সমস্ত কাব্য

---

(১) সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গল, ঘনরাম প্রভৃতি কবির কাব্যানুকরণ নহে, উহার বিষয় স্বতন্ত্র। নানাবিধ দেবদেবীর উপাখ্যান দ্বারা সংশোধিত করিতে চেষ্টা করিলেও কবি মূল বৌদ্ধ উপাখ্যানগুলি একেবারে পরাভূত করিতে পারেন নাই। হর-পার্ব্বতীর বিবাহ কথার অতি সান্নিধ্যে কালুপা, হাড়িপা, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গী প্রভৃতি বৌদ্ধ সাধুগণের কাহিনী স্থান পাইয়াছে। হরিশ্চন্দ্র, লুইচন্দ্র, ভূমিচন্দ্র, জাজপুরবাসী রামাই পণ্ডিতের কথা, জাজপুরনিবাসী ব্রাহ্মণগণের "ধর্ম্মদ্বেষ" প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম্মের রূপান্তর ও কৃত্রিম হিন্দুবেশ সূচিত হইবে; এই পুস্তকে রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতির কথা উল্লিখিত আছে,

"এ তিন ভুবন মাঝে শ্রীধর্ম্মের পূজা আছে,
রামাই করিল ঘর ভরা।"

ধর্ম্ম-সেবক ডোম জাতির নির্য্যাতনও বৌদ্ধ প্রসঙ্গ বলিয়া চিহ্নিত করা যায়।* কবি এই "ধর্ম্ম দেবের" প্রচার উপলক্ষ্যে হিন্দু দেব-দেবীগণের বিবিধ কীর্ত্তিকলাপ বর্ণন করিয়াছেন।"

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। ডাঃ দীনেশ সেন)

রচিত হইয়াছে, "শিবশক্তি অভেদাত্মক" বলিয়া আমি সেই সমস্ত শিবায়ন কাব্যগুলিকেও 'শাক্ত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলিতে ইচ্ছা করি। গীতি শাখার ইহাও একটি ধারা। খুঁজিলে কাব্যাংশ ইহাতে একেবারে মিলে না এমন নয়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী ছাড়িয়া যখন আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আসিয়া পড়ি, তখন ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের সহিত যুগপৎ আমাদের সাক্ষাৎলাভ ঘটে।

৩

ভারতচন্দ্রকে আমি শাক্ত সাহিত্যের ধারাতে রাখিয়াই দেখিতে চাই। ভারতচন্দ্রে গীতি-কবিতা আছে সত্য, তবে তাহাতে শক্তি-সাধনার গান অতি অল্প। নাই বলিলেও চলে। যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের আধুনিক ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহারা ভারতচন্দ্র ও তদনুগামীদের হস্তে হিন্দুর দেবদেবীর নানারূপ অশ্লীল আচরণে বড় ক্ষুণ্ণ হইয়া, দেবদেবী-বিরোধী —রাজা রামমোহনের আবির্ভাবকে অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (১) সাহিত্যিকের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া যদি,

(১) ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দরের আদর্শে যে কয়েকখানা কাব্য লিখিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে—"চন্দ্রকান্ত" কালীকৃষ্ণ দাসের "কামিনীকুমার" এবং রসিকচন্দ্র রায়ের "জীবনতারা"‥ * * ইঁহাদের রচনা এত অশ্লীল যে উহা পাঠে স্বয়ং ভারতচন্দ্রও লজ্জিত হইতেন। শুধু কঠোর সমালোচনা করিয়া নিবৃত্ত হইলে উক্ত কাব্য লেখকগণের যথোচিত শাস্তি হয় না, তাঁহারা নৈতিক আদালতের বেত্রাঘাত যোগ্য।

অপাপবিদ্ধ দেবদেবীগণ গর্হিত অশ্লীল আচরণে প্রবৃত্ত হন, তবে পরিতাপের বিষয় সন্দেহ কি! *কিন্তু হতভাগ্য দেবদেবীদের জন্য আর একটা ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের আখড়া খুলিবার ব্যবস্থা করিলেই ত চলিত। একেবারে যে কালাপাহাড়ী মুদ্গর রামমোহন তাহাদের বিরুদ্ধে চালাইলেন—তাহাতে ভ্রষ্ট দেবদেবীদের চরিত্র সংশোধনের কোনও রূপ সুব্যবস্থা না করিয়া তাঁহাদিগকে একেবারে প্রাণে মারা বড়ই নিষ্ঠুর কার্য্য হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু ভারতচন্দ্র ত বাঙ্গালীর সাধনাঙ্গের কবি নন। রাজসভায় রাজভোগে ভোগায়তন-পুষ্ট-দেহ কবি, অতুলন শব্দঝঙ্কারের কবি,—বাঙ্গালার গার্হস্থ্য ও সমাজ-জীবনের ধারা হইতে দূরে,—মুসলমানী বিলাসের আওতায় কবি, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সাধনাও ভারতচন্দ্রে সুর ও রূপ পায় নাই। সেই সাধনাঙ্গের কবি—রামপ্রসাদ, রামপ্রসাদের গানের রূপান্তরে (১) শিব-শক্তি যেরূপ কল্পকলায় ও তত্ত্বাঙ্গে রূপা-

এই তিনখানি কাব্যেই কালী নামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে। কালী নামের সঙ্গে সংস্রব হেতু আমাদিগের বৃদ্ধগণ এই সব পুস্তকের শৃঙ্গার রসের মধ্যেও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব দেখিয়াছেন—এবং প্রণিপাত পুরঃসর নিষ্কাম ধর্ম্ম পিপাসার সহিত উপাখ্যান ভাগ পাঠ করিয়াছেন। দেবদেবীগণ যখন এইভাবে পাপের আবরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে মহাপুরুষ রামমোহনের আগমনের সময় হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন)

* (১) "রামপ্রসাদের জীবনে রূপান্তর হইয়াছিল। তাঁহার সৃষ্টিও তাহারই প্রমাণ।" (চিত্তরঞ্জন, রূপান্তরের কথা। ১৯১৭ খৃঃ)।

স্তরিত হইয়াছেন,—সেই মাতৃভাবের সাধনায়—কোন্ ঐতিহাসিক অশ্লীলতার গন্ধ পাইলেন? যদি তা না পাইয়া থাকেন,—আর রামপ্রসাদের কালী সাধনায় যদি সিদ্ধিলাভ অসম্ভব বিবেচিত না হইয়া থাকে,—তবে রামপ্রসাদের কালীর রূপ—ধ্যান ও নামজপ,—বাঙ্গালীর ছাড়িবার কি হেতু বা প্রয়োজন ছিল? রামমোহনের—দেবদেবীমূর্ত্তি-বিদ্বেষ,—রামপ্রসাদের মূর্ত্তি সাধনার পাশে কি অনাবশ্যক এবং অনুচিত স্পর্দ্ধা ও দাম্ভিকতা নয়? রামমোহনের আগমনের অন্য যে প্রয়োজনই থাক,—ভারতচন্দ্রই যদি রামমোহনের আবির্ভাবের কারণ হন, তবে রামপ্রসাদ সত্ত্বেও তাঁহার আবির্ভাবের কোন হেতু খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর হইবে। আর ভারতচন্দ্রে কি অশ্লীলতা ছাড়া আর কোন গন্ধই পাওয়া যায় না? কি তীব্র আঘ্রাণশক্তি! আমি শিবশক্তি তত্ত্বের একটি গান ভারতচন্দ্র হইতে উদ্ধার করিতেছি—

ভব সংসার ভিতরে ভব ভবানী বিহরে
ভূতময় দেহ নবদ্বার গেহ
নরনারী কলেবরে।
গুণাতীত হয়ে নানাগুণ লয়ে
দোঁহে নানা কেলি করে।
উত্তম অধম স্থাবর জঙ্গম
সব জীবের অন্তরে।
চেতনাচেতনে মিলি দুইজনে
দেহী দেহরূপে চরে।

অভেদ হইয়া ভেদ প্রকাশিয়া
একি করে চরাচরে।
পাইয়াছে টের কি করে এ ফের
কবি রায় গুণাকরে।

কবি রায় গুণাকর বলিতেছেন যে, তিনি নিশ্চিত মনে টের পাইয়াছেন যে—ভব আর ভবানী—অভেদাত্মা হইয়াই ভেদ প্রকাশ করিয়াছেন—গুণাতীত হইয়া ও নানা গুণ লইয়া, চেতন অচেতনে, স্থাবর জঙ্গমে, নরনারী কলেবরে,—সমস্ত জীবের অন্তরে,—উত্তম অধম নির্ব্বিচারে,—সমগ্র বিশ্ব চরাচরে—'দোঁহে নানা কেলি' করিতেছেন। এই বিশ্বসৃষ্টি শিব আর শক্তির কেলি প্রসূত। এই 'কেলি' শব্দটির ভিতরে যদি কোন সাহিত্যের ইতিহাস লেখক কোন কিছু গন্ধ পান তবে আমরা নাচার। বাঙ্গালার বৈষ্ণব বলিয়াছেন—

রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হৈল চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম—

কাজেই সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলী কামায়ন! বাঙ্গালার শাক্ত বলিলেন যে, "মূলাধারে সহস্রারে বসিয়া মা আমার

* * * হংস সনে
হংসীরূপে করে রমণ।"

কাজেই সমগ্র শিব ও শ্যামা সঙ্গীত কামশাস্ত্র! শাক্ত ও বৈষ্ণব ছাড়িয়া, প্রকৃতির উপর পুরুষের বীক্ষণ, যদি দূরবীণ লইয়া নিরীক্ষণ করা যায়, তবে তাহাও বড় আশাপ্রদ মনে হইবে না।

অমন যে বেদান্তের ব্রহ্ম, মায়ার সহিত তাহার সংস্পর্শ টাও খুব নিরাপদ নহে। কাজেই বলিতে হয়,—

"বল মা তারা দাঁড়াই কোথা ?"

হাজার বছরের প্রাচীন বৌদ্ধ দোঁহা ও গানে সরুহ যে ভণিতা করিয়া গিয়াছেন তাহা এই :

জামে কাম, না কামে জাম
সরুহ ভণতি অচিন্ত্য সোধাম।

জনম হইতে কাম, না কাম হইতে জনম (১) সরুহ বলেন, যে সে ধাম অচিন্ত্য। সেই অচিন্ত্য ধামের খবর যাহাদের কাছে পৌঁছায় না, তাহাদের একটা জাতির আজনম সাধন লইয়া, সাহিত্য লইয়া এই বাচালতা ও ধৃষ্টতাকে প্রশ্রয় না দিলেই কি নয়? ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা—জন্ম দিল রাম-মোহনের শ্লীলতাকে? প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল, তুলিলেই কে জানে কি গরল উঠিবে? আমরা বাঙ্গালীর শাক্ত সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায়,—এইরূপ নানা বিচিত্র ঐতিহাসিক আবেষ্টন ও পরিবেষ্টনের মধ্যে রামপ্রসাদের গীতি কবিতায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

(১) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অন্যরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ এইরূপ:—"সরুহ বলে, জন্ম হইতে কর্ম্ম হয়, কি কর্ম্ম হইতে জন্ম হয়, সে কথা স্থির করা যোগীদিগের পক্ষে অচিন্তনীয়।" পণ্ডিত হরপ্রসাদ কামকে কর্ম্ম বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। স্পষ্টতঃই দেখা যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই অনুবাদ গ্রহণ করিতেছেন না। (বৌদ্ধ গান ও দোঁহা। মুখবন্ধ ৯ পৃঃ)। সম্পাদক।

রামপ্রসাদের গানের মন্দিরে প্রবেশ করিবার পথে এ যুগের বাঙ্গালীর পক্ষে কতকগুলি বাধা আছে। নাম, রূপকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার—একটা অছিলা—শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই পাইয়া বসিয়াছে। যে চরম অদ্বৈতজ্ঞানে নাম, রূপ মিথ্যা প্রতিভাত হয়,—প্রতি-ভাসিক ও ব্যবহারিক সত্ত্বা লুপ্ত হয়—সে অদ্বৈতজ্ঞানে, সে অদ্বৈত সমাধিতে ডুবিয়া যে ইংরাজী-নবিশ বাঙ্গালী নাম, রূপকে মিথ্যা ভাবিয়াছে,—আমি তা মনে করি না। পরম্পরাগত যে নাম জপ ও রূপ ধ্যানের মধ্য দিয়া বাঙ্গালী ধর্ম্ম সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছে,—ঐ ফেরঙ্গ যুগের বিকৃত আদর্শে সাধন-ভ্রষ্ট বাঙ্গালী, অনাচারী হইয়া, যে দায়িত্বহীন অধর্ম্মে বা পরধর্ম্মে গা ভাসাইয়াছে,—বাঙ্গালার চিরন্তন নাম-রূপের বর্জ্জনে আমি তাহারই পরিচয় পাইতেছি। কাজেই রামপ্রসাদের গানের মন্দিরে বাঙ্গালার চিরন্তন সাধন-ভ্রষ্ট ফেরঙ্গ-বাঙ্গালী, আজ প্রবেশ করিবে কোন্ পথে ?

এক অতি বীভৎসা উলঙ্গিনী রমণী মূর্ত্তির নাম জপে ও রূপ ধ্যানে, আজ ইংরাজী জানে এমন কয়জন বাঙ্গালীকে হাতে পায় ধরিয়া রাজী করান যাইতে পারে—আমি জানি না। (১)

(১) "If the image of the naked and horrid Kali ; * * the barbaric art of our illiterate potters and painters, really helps the spiritual growth of a Theist, he may have these images constantly before his eyes ; . . . but to join with the ignorant, the thoughtless and the unspiritual, the victims of priestly selfishness and cupidity,

অথচ ইঁহারাই—রামপ্রসাদের সাধনার ও কল্পকলার—একমাত্র অভ্রান্ত মল্লিনাথ!

এই কালী নামের পশ্চাতে,—এই হর-হৃদ্‌বাসী সর্ব্বনাশী, বিবসনা, এলোকেশীর রূপের পশ্চাতে,—এমন একটা জ্ঞান বিজ্ঞান মিশ্রিত আছে—যাহাকে ফেরঙ্গ যুগের পূর্ব্বে বাঙ্গালী জন্ম সত্ত্বেই বুঝিতে পারিত। কিন্তু আজ আর তা হয় না। একশ বছরে এই তফাৎ দাঁড়াইয়াছে। শুধু কি সে জ্ঞান নাই? যে ভাবের ভাবুক হইলে রামপ্রসাদের গীতি মন্দিরে প্রবেশের অধিকার জন্মিতে পারে, সে ভাবের কণামাত্রও আমরা আজ দাবী করিতে পারি না। এই অজ্ঞানে, অভাবে,—এমন কি মনে কত কুভাব পর্য্যন্ত লইয়া আমরা জগতের একজন শ্রেষ্ঠ সাধকের (১) গানের মন্দিরে প্রবেশের পথে দাঁড়াইয়াছি। এই মন্দিরে নানা কোঠা আছে, সর্ব্বশেষ মণিকোঠা আছে।

in the ceremonial worship of idols, is either foolishness of the rankest kind, or mere sophistry or hypocrisy admitting of no intellectual or moral support from thoughtful and conscientious people."... The **Philosophy of Brahmoism**... p. 319-20. by Pandit Sitanath Tattvabhushan.

উপরে উদ্ধৃত অংশটুকু চিত্তরঞ্জনকে প্রবন্ধ লিখিবার সময় পাঠ করিয়া শুনান হইয়াছিল। সম্পাদক।

(১) "রামপ্রসাদের শবসাধন, চিতাসাধন, শক্তিসাধন, মহাশঙ্খের মালা, বিল্বমূল, পঞ্চমুণ্ড প্রভৃতি আসনের জ্বলন্ত প্রমাণ এখনও দেদীপ্যমান।"

[রামপ্রসাদ। শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ৬৮]

লোকে বলে একাধিক (১) রামপ্রসাদ ছিল, তাঁহাদের গান একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে।. আমি এই কিংবদন্তী স্মরণে রাখিয়া সমস্ত গানগুলি যতবার খোঁজাপাতা করিয়াছি, ততবারই একজন শিল্পীর হাতের নিদর্শনই পাইয়াছি। যদি আমার ভ্রম হইয়া থাকে, আশা করি দয়া করিয়া, কেহ আমার

(১) "রামপ্রসাদের নামে প্রচলিত সমস্ত সঙ্গীতই যে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের রচিত তাহা আমরা বলিতে চাহি না। রামপ্রসাদ, প্রসাদ, দ্বিজ রামপ্রসাদ, দীন রামপ্রসাদ, ভিষক প্রসাদ, রামপ্রসাদ দাস প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত প্রসাদী সুরে বিরচিত অনেক গান যে কবিরঞ্জনের পরবর্ত্তী কোন মাতৃভক্ত সাধক কবির ভাবপ্রসূত তাহা আমরাও অস্বীকার করি না। কিন্তু গানের শেষে দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণিতা আছে বলিয়াই যে তাহা বৈদ্য কবি রামপ্রসাদ সেনের রচিত নহে এরূপ সিদ্ধান্তের আমরা পক্ষপাতী নহি।" * *

[রামপ্রসাদ। শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ২৫০]

* * * "তবে ব্রাহ্মণ বংশ সম্ভূত অন্য কোন রামপ্রসাদ কবিরঞ্জনের অনুকরণে স্বয়ং প্রসাদী সুরে গান বাঁধিয়া অথবা কবিরঞ্জনের গানেরই দীন রামপ্রসাদ ভণিতা পরিবর্ত্তন করিয়া "দ্বিজ রামপ্রসাদ" ভণিতা সংযোগে জগন্মাতার নিকট আত্মনিবেদন করিয়াছেন কিনা তাহা স্থিরভাবে নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই।"

[রামপ্রসাদ। শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ২৫১]

"বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসেরও অনেক পদ ভণিতার ও ভাষার পরিবর্ত্তনে অন্যের নামে প্রচারিত হইয়াছে, পক্ষান্তরে অন্যের রচিত পদ ও ভাবও ভাষার মাধুর্য্যে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের গান বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, বঙ্গের সঙ্গীত সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে যাঁহাদের সামান্য অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারাও একথা অবগত আছেন। অভিনিবেশ সহকারে রামপ্রসাদের নামে প্রচলিত পদগুলি পাঠ করিলে প্রসাদী সঙ্গীত সম্বন্ধেও কতকটা উক্ত ভাবের ধারণা জন্মে।"

[রামপ্রসাদ। শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ২৫১]

এই ভ্রম দূর করিয়া দিবেন। এই গানগুলিতে একজন শিল্পীর হাত দেখা গেলেও ইহার রচনা সৌষ্ঠবে, ইহার ভাবের ক্রমিক উৎকর্ষতার মধ্যে একটা সাধক-জীবনের বৈচিত্র্যময় ইতিহাস অতি সহজেই চক্ষে পড়ে।

"পূর্ব্ববঙ্গে চিনিষপুরে রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী নামে জনৈক সাধক ছিলেন এবং তিনি প্রসাদী সুরে গান গাহিতেন, এই প্রবাদ বাদ হইতে তিনি 'দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণিতাযুক্ত পদগুলি রচনা করিয়াছেন' এরূপ অতি-বিশ্বাসমূলক অনুমানও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।"

[রামপ্রসাদ। শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ২৫২]

"রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর গৃহস্থ অবস্থায় রামপ্রসাদ নাম কেন যে থাকিবে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। মহারাজ রামকৃষ্ণের সহোদর রামপ্রসাদ যে চিনিষপুরের রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী নহে তাহা উহাদের নামের প্রভেদ হইতেই প্রমাণিত হয়।"

(রামপ্রসাদ। শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ২৫২)

"বৈদ্যজাতীয় সেন রামপ্রসাদের দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণিতা প্রয়োগে যদি আত্মাভিমান প্রকাশ পায়, সংসারাশ্রমত্যাগী বনবিহঙ্গের ন্যায় বিচরণশীল ব্রহ্মচারী রামপ্রসাদ নিজকে দ্বিজ বলিয়া অভিহিত করিলে কেন যে অভিমানের ভাব ব্যক্ত হইবে না তাহাও আমাদের ধারণার অতীত।"

(রামপ্রসাদ। শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ২৫৩)

"কবিরঞ্জন রামপ্রসাদই কোন কোন সঙ্গীতে দ্বিজ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন কিনা, ইহা একটি গুরুতর প্রশ্ন। কারণ, যে সকল সঙ্গীতে 'দ্বিজ' ভণিতা আছে, সে সকল অপেক্ষাকৃত লঘু ভাবাত্মক। কিন্তু কবি রামপ্রসাদের সঙ্গীত সকল অতীব গভীর ভাবাত্মক। * * বৈদ্যেরও উপনয়ন ও গায়ত্রীতে অধিকার আছে। কবিরঞ্জন তাহা হইতেই আপনাকে 'দ্বিজ' বলিয়াছেন। তরুণ যৌবনের ঔদ্ধত্যবশে হয়ত প্রসাদ এইরূপ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকিতে পারেন।"

(রামপ্রসাদ। শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ২৫৩—২৫৪)

আমি মোটামুটি হিসাবে, বহু খণ্ডস্তর ও বিভাগ মুছিয়া দিয়া, মাত্র দুইটি শ্রেণীতে রামপ্রসাদের গানগুলিকে সন্নিবেশ করিতে চাই। একশ্রেণীর গান সাধনের সময় রচিত, আর এক শ্রেণীর গান—সিদ্ধি বা সমাধির অবস্থায় রচিত। অবশ্য সাধন হইতে সিদ্ধির পথে যে সমস্ত গান রচিত, তাহা নিঃসন্দেহে আর এক তৃতীয় শ্রেণীতে পর্য্যবসিত করা যাইতে পারে। (১) কিন্তু ভাবের ন্যূনাধিক তৌল করিয়া সেগুলিকে হয় সাধনা কিম্বা সিদ্ধির কোঠার গানের মধ্যে ঠেলিয়া দেওয়া, নিপুণ সমালোচনা না হইলেও, কবির উপর নিতান্ত অবিচার হইবে না।

রামপ্রসাদের গানে কৃত্রিম লিপিচাতুর্য্য কম। ভারতচন্দ্র হইতে এইখানে তাঁহার পার্থক্য! তথাপি চরিত্র বিশ্লেষণে,

---

একাধিক চণ্ডীদাসের মত, একাধিক রামপ্রসাদ ছিলেন কি না, এবং বিভিন্ন ভণিতার অন্তরালে বিভিন্ন কবি, না, একজন কবিই ছিলেন, - এই রকমের সমস্যা দ্বারা যে আমরা সম্প্রতি আক্রান্ত হইয়াছি, তাহাই দেখাইবার জন্য উপরের অংশগুলি উদ্ধৃত করা হইল মাত্র। সম্পাদক।

(১) "তাহার পর রামপ্রসাদের গান আমরা কয় ভাগে ভাগ করিতে পারি। কালীকীর্ত্তন, শিবসঙ্গীত, কৃষ্ণসঙ্গীত ও তত্ত্বসঙ্গীত। রামপ্রসাদ তাহা ছাড়া বিদ্যা-সুন্দর ও অন্যান্য অনেক রচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার গীতি কবিতার এই দ্বিতীয় পল্লবে আমরা রামপ্রসাদের যুগের সঙ্গে পরিচিত হইতে চেষ্টা করিব। আজুগোঁসাই, রামদুলাল, কমলাকান্ত প্রভৃতি সকলে রামপ্রসাদকেই অনুসরণ করিয়াছেন।"

(চিত্তরঞ্জন—বগুড়া, ১৯১৭ খৃঃ)

ভারতচন্দ্র হইতে রামপ্রসাদের ক্ষমতা কম ত কিছুতেই নয়, চাই কি বেশীও হইতে পারে। (১) রামপ্রসাদে সংস্কৃত ও মুসলমানী প্রভাব, বিশেষতঃ বৈষ্ণব প্রভাব স্পষ্টই লক্ষিত হয়; কিন্তু ভাবে ও প্রকাশে, রূপে ও সুরে রামপ্রসাদ অভিনব, অনুপম, অদ্বিতীয়। মনসার ভাসান, চণ্ডীর গান প্রভৃতিতে কালীর মাহাত্ম্য যে বাঙ্গালী শুনিয়া আসিয়াছে, সেই বাঙ্গালী রামপ্রসাদের প্রসাদী-সঙ্গীতে জগজ্জননীর সহিত এমন এক আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল, যাহা সত্যই বাঙ্গালীকে এক আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিচরণ করিবার অধিকারী করিয়া গিয়াছে।

(১) ভারতচন্দ্র—জন্ম ১৭১২ খৃঃ অনুমান (?), মৃত্যু ১৭৬০ খৃঃ।

রামপ্রসাদ—জন্ম ১৭১৮-২৩ খৃঃ অনুমান (?), মৃত্যু—?

(ক)—(ভারতচন্দ্রের) "অন্নদামঙ্গলের অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দরের রচনা কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরের রচনা অপেক্ষা অনেক মধুর, অনেক চাতুর্য্য-সম্পন্ন ও অনেক উৎকৃষ্ট।" (৺রামগতি ন্যায়রত্ন রচিত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—পৃঃ ১৬০)

"রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের সম-সাময়িক হইলেও ইঁহাকে (রামপ্রসাদকে) আমরা মধ্যকালের শেষে, এবং ভারতচন্দ্রকে ইদানীন্তন কালের প্রথমে স্থান দিলাম—নচেৎ ইঁহাদিগকে একস্থানে বসাইলেই চলিত।" (৺রামগতি ন্যায়রত্ন—বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—পৃঃ ১৬৯)

(খ) "ভারতচন্দ্র জন্ম ১৭১২ খৃঃ অনুমান (?), মৃত্যু ১৭৬০ খৃঃ। রামপ্রসাদ জন্ম ১৭১৮-২৩ খৃঃ অনুমান (?), মৃত্যু—?"

"রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দরের ভাষাকে অলঙ্কার পরাইয়া সুন্দরী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র সেই সব অলঙ্কার লইয়া ভাষাকে সাজাইয়াছেন। একটু

ভারতচন্দ্রের মত ছন্দের গতি-বিন্যাস, শব্দের ঝঙ্কার রামপ্রসাদে নাই। কবিতায় বুদ্ধির খেলা যুক্তির মারপ্যাঁচ ইহাতে কম। অবিচারে লোক-রুচির সমর্থন, রাজানুগ্রহের মোহ ও মাদকতা, আত্মাবমাননা এ কিছুই রামপ্রসাদে ছিল না। ভারতচন্দ্রে ছিল। ভারতচন্দ্র হইতে আমরা প্রথমেই রামপ্রসাদের স্বাতন্ত্র্য, গীতি কেশরীর রাজসভা হইতে দূরে পল্লীপ্রান্তে নির্জ্জন গরিমায় আত্মপ্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই। (১)

সাধারণ সৌন্দর্য্য বোধের অভাবে রামপ্রসাদের বিরাট চেষ্টা পণ্ড হইয়া গিয়াছে। সেই পণ্ডশ্রমের শ্মশানে অদ্য ভারতচন্দ্রের যশোমন্দির উত্থিত হইয়াছে।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ইতিহাস। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন।)

উপরে উদ্ধৃত মতবাদে পরবর্ত্তী লেখক তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীকে (মায় অনুমানমূলক জন্ম মৃত্যু তারিখ সহ) অনুকরণ করিয়া একমত হইয়াছেন। কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালা সাহিত্যের খ্যাতনামা এই দুই ইতিহাস লেখক হইতে এক্ষেত্রে ভিন্ন, এমন কি বিপরীত মতবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যসেবিগণ এই বিভিন্ন মতবাদ বিচার করিবেন। আমি শুধু দেশবন্ধুর মতের যে স্বাতন্ত্র্য, তাহারই উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি মাত্র। দেশবন্ধু বলিতেছেন—

(১) ভারতচন্দ্রের লিপিচাতুর্য্য কৃত্রিম। রামপ্রসাদে কৃত্রিমতা কম।

(২) রামপ্রসাদের মানব-চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষমতা—ভারতচন্দ্র হইতে কম নয়। বেশী হইতে পারে।

দেশবন্ধুর এই অভিনব সমালোচনা ও নূতন মতবাদ তাঁহার মুখে কথাপ্রসঙ্গে আমি বহুবার শুনিয়াছি, ইহা তাঁহার সুচিন্তিত মত।—সম্পাদক।

(১) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মধ্যে মধ্যে বায়ু সেবনের জন্য কুমারহট্ট আসিতেন। একদা সেখানে আসিয়া রামপ্রসাদের গান শুনিয়া মুগ্ধ হন। এবং তাঁহাকে ভারতচন্দ্রের মতই সভাকবি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রামপ্রসাদ তাহাতে অস্বীকৃত হন। তথাপি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রীত্যর্থ রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থ প্রথম প্রণয়ন

করেন। এবং কৃষ্ণচন্দ্রকেই তাহা উপহার প্রদান করেন। কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে কবিরঞ্জন উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন এবং ১১৬৫ সালে ১৪ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। "গড় আবাদি জঙ্গল ভূমি আবাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিতে থাক।" ১১৬৫ সাল ১৭৫৯ খৃঃ পলাশীর যুদ্ধের ২ বৎসর পর হইবে। তখন মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে ক্লাইবের অধীনে মিরজাফর নবাব নিযুক্ত হইয়াছেন। রামপ্রসাদ এক মহা সঙ্কটপূর্ণ পরিবর্ত্তন যুগের কবি। যদি (১৭১৮-২৩ খৃঃ মধ্যে) রামপ্রসাদের জন্ম হইয়া থাকে, তবে ১৭৫৭ খৃঃ পলাশী যুদ্ধের সময় তাঁহার বয়ক্রম ৩৪-৩৯ বৎসর মধ্যে হইবে। পলাশীর যুদ্ধের ঝটিকা তাঁহার মনকে আলোড়িত করিয়াছিল ইহা নিশ্চিত। তাঁহার কাব্য-সৃষ্টিতে কি ইহার কোন নিদর্শন নাই?—সম্পাদক।

রামপ্রসাদের মানসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তর

দ্বিতীয় পল্লব

[রামপ্রসাদ একজন সাধক ছিলেন— তাঁহার সাধনাই তাঁহার কাব্যে ও গানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।—কালী মূর্ত্তির ধ্যান বাঙ্গালী জাতির একটি বিশেষ সাধনা। বাঙ্গালীর একটি বিশেষ সাধনা, রামপ্রসাদের জীবনে ও কাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের তুলনা—

রামপ্রসাদের সাধক জীবন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার গানের বিভিন্ন স্তর। রামপ্রসাদের গানের মূলতত্ত্ব এই:—বিশ্বের আদি অন্তে সৃষ্টি প্রবাহে যা কিছু ঘটিতেছে তা সমস্তই বাজীকরের মেয়ে, তার শ্যামা মায়ের নাচ। এই বিশ্ব-নৃত্যই কালীর নৃত্য। বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যই এই নৃত্যের ছন্দে গ্রথিত। ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, সমস্তই মায়ের নৃত্যের তালে তালে জাগিয়াছে। ইহার একটা পাপ আর একটি পুণ্য, এইরূপ পৃথক করিয়া রামপ্রসাদ দেখেন নাই। এইখানেই শাক্ত ও বৈষ্ণবের দার্শনিক দৃষ্টি একই প্রকার উদার। এইখানেই শাক্ত ও বৈষ্ণব বাঙ্গালার একই প্রাণ হইতে জন্মিয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

রামপ্রসাদই বিশ্বকবি—কেননা তাঁহার কাব্যে ও সাধনায় যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী তিনি প্রকাশ পাইয়াছেন। ইংরেজ আগমনের পূর্ব্বে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াও বাঙ্গালার কবি বিশ্বকবি হইতে পারিয়াছেন।

বাঙ্গালীর গানে দেহতত্ত্ব-মূলক এক শ্রেণীর গান চণ্ডীদাসেও আছে, রামপ্রসাদেও আছে। দেহ শয়তানের, আর আত্মা ভগবানের, ইহা খৃষ্টান পাদ্রীদের কথা, ইহা বাঙ্গালীর সাধনার কথা নয়। শাক্তেরও নয়, বৈষ্ণবেরও নয়। দেহতত্ত্বের গান চণ্ডীদাসেও আছে, রামপ্রসাদেও আছে। কারণ, বাঙ্গালার একই স্বরূপ হইতে ইঁহাদের জন্ম। শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের কথাই আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু দৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে, বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপ শাক্ত ও বৈষ্ণব দুই নহে, এক।]

সাধন সময়ে রামপ্রসাদ যে সমস্ত গান রচনা করিয়াছিলেন—তাহাতে ভোগায়তন দেহের জন্য অনিত্য সুখ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া—প্রথম নামে রুচি আনিবার জন্য কতমতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

রামপ্রসাদ মনকে প্রথমেই বুঝাইয়াছিলেন—যে ওরে মন, যদি অভয়পদে বাসা লবে, তা হ'লে অনিত্য সুখের আশা তুমি ছাড়।

মন করো না সুখের আশা,
যদি অভয় পদে লবে বাসা।
হয়ে ধর্ম্ম তনয় ত্যাজে আলয়
বনে গমন হেরে পাশা।
হয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক তেঁইতো
শিবের দৈন্য দশা।

*　　　*　　　*

সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে
ও মন সুখের আশা বড় কসা।

হরিষে বিষাদ আছে মন,
ক'রোনা এ কথায় গোঁসা
ওরে সুখেই দুঃখ, দুঃখেই সুখ
ডাকের কথা (১) আছে ভাষা।

---

(১) ডাক ও খনার বচন :—(ক) এই সকল বচন বচনার সময় বুদ্ধদেবের প্রভাব বঙ্গদেশ হইতে উৎপাটিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না।

(খ) এই সব বচন মানিকচাঁদের গান হইতেও অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।

(গ) খনার বচনের প্রচলন অত্যন্ত অধিক, এই জন্য কালক্রমে তাহাদের ভাষা ক্রমশঃ সহজ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ডাকের বচন ততদূর প্রচারিত হয় নাই, এই জন্য সেগুলি ভাষার প্রাচীনত্ব অনেকাংশে রক্ষা করিয়াছে।

(ঘ) ডাক নামক জনৈক গোপ 'ডাকের বচন' প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে।

(ঙ) ডাক ও খনা দুর্ভেদ্য অন্ধকার জাল হইতে জ্ঞান রশ্মি বিকিরণ করিতেছেন। * * * এইসব বচনে কবিত্ব কিছুই নাই, উহারা কঙ্কালসার সত্য। ভাষা উহাদিগকে সাজাইয়া বাহির করে নাই।

(চ) খনা ও ডাকের বচন দুইরূপ সামগ্রী। খনা কৃষক ও গ্রহাচার্য্যের নজির। ডাকের বচনে জ্যোতিষ ও ক্ষেত্রতত্ত্বের কথা আছে সত্য, কিন্তু তাহাতে মানবচরিত্রের ব্যাখ্যা বেশী।

(ছ) ডাকের কথার নমূনা :—

১। বলে ডাক এই সংসার
আপনা মইলে কিসের আর

—এখানে 'ডাক' চার্ব্বাক মতাবলম্বী। বিদ্যোন্মাদ তরঙ্গিনী বলেন যে, বৌদ্ধেরা এক সময়ে চার্ব্বাক মতাবলম্বী হইয়াছিলেন।

২। ঘরে আখা বাইরে রাঁধে
অল্প কেশ ফুলাইয়া বাঁধে॥

চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, "সুখ দুঃখ দুটী ভাই।" রামপ্রসাদ বলিলেন, "সুখেই দুঃখ, দুঃখেই সুখ।" বিভিন্ন সাধনপথে অন্তর্দৃষ্টিতে সেই একই অনুভূতিতে যে বাঙ্গালার সাধকেরা উপনীত হইয়াছিলেন ইহা তাহার প্রমাণ।

রামপ্রসাদ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না। স্ত্রী (২) পুত্র লইয়া তিনি সংসারী ছিলেন। তাঁহার অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল না। তিনি অভিমান করিয়া জগজ্জননীকে কত ভর্ৎসনা করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে মায়ের দয়াময়ী নাম একেবারেই মিথ্যা, নইলে—

ঘন ঘন চায় উলটি ঘাড়
ডাক বলে এ নারী ঘর উজার।

৩। নিয়র পোখরি দূরে যায়।
পথিক দেখিয়ে আউরে চায়॥
পর সম্ভাষে বাটে থিকে।
ডাক বলে এ নারী ঘরে না টিকে।

ইহা নারী চরিত্রের ব্যাখ্যা—

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন)

(২) বিপত্নীক হইয়া রামপ্রসাদ পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন—এইরূপ প্রবাদ আছে।—সম্পাদক।

রামপ্রসাদ বলিতেছেন—

"এই সংসার ধোকার টাটি। ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি।"

আজু গোসাইর উত্তর—

"যদি ধোঁকাই জান তবে কেন তিনবার কেঁচেছ ঘুঁটি।"

পুত্র না হওয়াতে রামপ্রসাদ ক্রমে ক্রমে তিনবার বিবাহ করিয়াছিলেন, তাই এই শ্লেষোক্তি॥ (এ কবিতা বঃ ২৭৮)

'কারু দুগ্ধেতে বাতাসা'
আমার এম্নি দশা শাকে অন্ন মেলে কৈ ?
কারু আছে কত ধন জন, হস্তি অশ্ব রথচয়
ওগো তারা কি তোর বাপের ঠাকুর,
আমি কি তোর কেহ নই ?

জগজ্জননীর নিকট এই স্নেহের অভিমান ; আর এমন প্রাণস্পর্শী সরল শিশুর কণ্ঠে তাহার প্রকাশ বাঙ্গালার গীতি কবিতার এক অমূল্য সম্পদ। একদিকে সাংসারিক অসচ্ছলতা, আর একদিকে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজানুগ্রহের প্রবল মোহ—রামপ্রসাদ সাধনের প্রথম অবস্থায় এই পরীক্ষার মধ্যে পতিত হইয়া প্রথমেই মনকে বুঝাইলেন—মন গোঁসা করো না,—অনিত্য সুখ কিছু নয়। একদিকে মনকে এইরূপ বুঝাইতেছেন—আর একদিকে—জগজ্জননীর নিকট অভিমান আব্দার এমন কি স্নেহমাখা তীব্র মধুর ভর্ৎসনা করিতেছেন। সাধকের জীবনের এই অবস্থা কল্পকলায় কি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, নাম জপ বলিয়া একটা আবহমান কালের সাধন পদ্ধতি অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালাও ভুলিতে পারে নাই। রামপ্রসাদের সাধক জীবনে, ও সেই সাধক জীবনের যে রূপ ও সুর তাঁহার গানে রূপান্তরিত হইয়াছে সেই প্রসাদী গানে, নাম জপের বহু নিদর্শন আমরা পাই। রামপ্রসাদ সাধনের নানা অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার পথে নানা ভাবে এই নাম-জপকে অবলম্বন করিয়াছেন। এই নামজপের

বিরুদ্ধে তর্ক উঠিয়াছিল এবং উঠিবে। কিন্তু রামপ্রসাদ বলেন—

কালী যার হৃদে জাগে
তর্ক তার কোথা লাগে

এ কেবল বাদার্থ মাত্র—খুঁজে দেখ ঘট পটেরে।

তাই রামপ্রসাদ পুনঃ পুনঃ রসনাকে কালী নাম জপিবার জন্য, রসনাকে বশ করিয়া শ্যামা নামামৃত রস গান ও পান করাইবার জন্য সাধ্য সাধনা করিয়াছেন।

সুধাময় কালীর নাম, কেবল কৈবল্য ধাম
করে জপ না কালীর নাম কি তব উৎকট রে।
শ্রুতিরসে তত্ত্বগুণে, অন্য নাম নাহি শুনে
প্রসাদ বলে দোহাই দিয়ে কালী বলে কাল কাটরে।

আমরা এই গানের ভিতর কি দেখিতেছি? একটা জগজ্জয়ী সাধনার পূর্ব্বাভাস। তর্কে বিরতি, নামে রুচি, হস্তকে নাম জপ, রসনাকে নাম কীর্ত্তন, শ্রবণেন্দ্রিয়কে অন্য নাম না শুনিয়া—কালী নাম গান করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। এই অবস্থার ও এই শ্রেণীর আরও অন্যান্য বহু গান দেখা যায়।

১। কালী কালী বল রসনারে—

২। ও মন, তোর নামে কি নালিশ দিব,
ও তুই শকার বকার বলতে পারিস,
বলতে নারিস দুর্গা শিব?

৩। ডাকরে মন কালী বলে—

৪। মনরে তোর চরণে ধরি, কালী বলে ডাকরে ওরে মন—

৫। কালী নাম জপ কর যাবে কালীর কাছে
কালী ভক্ত জীব যে ভাবে যে আছে।

৬। কালী কালী বল রসনা।

৭। কালী তারার নাম জপ মুখেরে
যে নামে শমন ভয় যাবে দূরে রে।—

প্রভৃতি গানগুলি এই শ্রেণীর। আবার যেখানে সাধক অভিমান করিয়া বলিতেছেন যে—আর কালী বলে ডাকব না—সেগুলিও বাহ্য অভিমানের আবরণে বস্তুতঃ নাম জপের গান—যেমন—

১। আর তোমায় না ডাকবো কালী
ঐ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে
মা হয়ে তার মাথা খেলি।

২। মা বলে ডাকিস্ না রে মন,
মাকে কোথা পাবি ভাই।
থাক্‌লে এসে দেখা দিত,
সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই॥
শ্মশান মশান কত, পীঠস্থান ছিল যত,
খুঁজে হ'লেম ওষ্ঠাগত, মিছে কেন যন্ত্রণা পাই॥

৩। মা, মা, বলে আর ডাকবো না—
ডাকি বারে বারে মা, মা, বলিয়ে—
মা কি রয়েছে চক্ষু কর্ণ খেয়ে—

মা বিদ্যমানে এ দুঃখ সন্তানে—
মা ম'লে কি আর ছেলে বাঁচে না। (১)

(১) [গৌরী-গান্ধার একতালা]
মা মা ব'লে আর ডাক্‌ব না।
ও মা দিয়েছ কতই যন্ত্রণা॥
ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী,
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা বলে আর কোলে যাব না॥
ডাকি বারে বারে মা বলিয়ে,
মা কি রয়েছ চক্ষু-কর্ণ খেয়ে
মা বিদ্যমানে, এ দুঃখ সন্তানে
মা ম'লে কি আর ছেলে বাঁচে না॥
ভ'ণে রামপ্রসাদ মায়ের কি এ তত্ত্ব,
মা হ'য়ে হলি মা সন্তানের শত্রু,
দিবানিশি ভাবি, আর কি করিবি,
দিবি দিবি পুন জঠর যন্ত্রণা॥

"HE IS BECOME A MENDICANT."

No longer I call you, Mother, who have sent
Me countless ills, and countless others send.
Dear ones I had, a home to me, a friend,
But you have made of me a mendicant.
What worse can you, O Long-Ttressed Goddess
do?
I must a beggar go from door to door,
But should the mother die,

নাম জপ করিতে করিতে যখন কালীর কালঘনরূপ ধ্যানে প্রকট হইতেছে না—এ সেই অবস্থার গান। মাকে ডাকিয়া ডাকিয়া ছেলে যখন হয়রাণ হইয়া পড়িয়াছে—অথচ মার দেখা নাই—ইহা সেই অবস্থায় সন্তানের অকৃত্রিম অভিমানের গান, কল্পকলায় কি সুন্দর পরিণতি লাভ করিয়াছে। অপর কোন সাহিত্যে ইহার তুলনা কি আমায় কেহ দেখাইতে পার ?

নাম জপের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ সাধকের মন ইষ্টদেব বা দেবীর রূপ-ধ্যানে মগ্ন হয়। রামপ্রসাদ কালী মূর্ত্তির যে ধ্যান করিয়াছেন, শাক্ত সাহিত্যের ধারায় সেই মূর্ত্তি কয়েক শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী সাধক ও সাহিত্যিকদের দৃষ্টি পথে জাগ্রত রহি-

Lives not the child ? I cry
Mother, and again I cry,
But deaf and blind are you.
The mother lives, yet the child suffers so—
What is his mother's use to him ? I say :
"Is this a mother's way—
To be her own child's foe ?
I muse both night and day
What I should do, I, when
You make me endure
The pangs of birth again and yet again."
—"Bengali Religious Lyrics."—Sakta.
Selected and translated by Edward J. Thompson and Arthur Marshman Spencer.

য়াছে। এই কালী মূর্ত্তির ধ্যান বাঙ্গালী জাতির একটা বিশেষ সাধনা। (১) বাঙ্গালীর একটা বিশেষ সাধনা রামপ্রসাদের জীবনে সিদ্ধ হইয়াছে, বাঙ্গালীর সাহিত্য ধারার একটি রূপকে রামপ্রসাদের কল্পকলা শ্রেষ্ঠ রূপান্তরে লইয়া গিয়াছে।

---

(১) 'অভয়া বলেন বাছা ভয় ত্যজ দূর।
দানব-দলনী মোরে জানে সুরাসুর॥
বধেছি নিশুম্ভ, শুম্ভ জম্ভের নন্দন।
রক্তবীজ চণ্ড মুণ্ড ধূম্রলোচন॥
অপর বধেছি কত দুস্তর দানব॥
কোন্ ছার মূঢ়মতি মামুদা মানব॥
সাহসে সমরে শীঘ্র সাজ সীমন্তিনী
তুমি রণে উপলক্ষ, যুঝিব আপনি॥

—ঘনরাম শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।

* * * * * *

হেনকালে নানামূর্ত্তি ধরিলা রঙ্গিনী॥
খড়্গিনী শূলিনী কেহ গদিনী চক্রিণী।
শঙ্খিনী চাপিনী ঘোরা নৃমুণ্ড মালিনী॥
কেহ ভীমা ভয়ঙ্করী ভৈরবী ভীষণা।
কালী কপালিনী কেহ করাল বদনা॥
বাম হাতে অসি কারো ডাহিনে খর্পর।
বিপরীত ডাক ডাকে ডাগর ডাগর॥
ঘোর মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী ঘূর্ণিত লোচনা।—ইত্যাদি

ঘনরাম—শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।

* * * * * *

"নৃসিংহ নাশিনী নমো নগেন্দ্রনন্দিনী।
নৃমুণ্ড মালিনী খড়্গ খর্পর ধারিণী॥

রামপ্রসাদ যে সমস্ত গানে কালীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, সেই গানগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। কতকগুলি গান কালীর বাহিরের রূপ বর্ণনায় নিয়োজিত। সেগুলি সম্ভবতঃ সাধনের প্রথম অবস্থায় রচিত। ইহা ছাড়া কালীর রূপ বর্ণনার সঙ্গীতগুলিতে শব্দ বিন্যাসের পারিপাট্য ও কলার প্রসাধন দেখিয়া মনে হয়, ইহা নিশ্চিতই প্রথম অবস্থার লেখা। কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে কাব্যে, ও গানে, ছন্দ ও শব্দ বিন্যাসেব প্রতি যে একটা প্রসাধন লক্ষ্য করা যায়, ইহা তাহারই পরিচয়। ভারতচন্দ্র (২) এই কলা-প্রসাধনে সিদ্ধ হস্ত। কিন্তু ছন্দের গতি আর শব্দের ঝঙ্কার আমি কবিতার

করাল বদনা কালী কৃপা কর মা।
কেবা নাহি পার হ'লো -পূজে রাঙ্গা পা।।"
ঘনরাম—শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।

১৭১১ খৃঃ ঘনরাম 'ধর্ম্মমঙ্গল' রচনা করেন। বৌদ্ধ 'ধর্ম্মঠাকুরের' পূজার মহিমা ঘোষণা করিতে গিয়াও রামপ্রসাদের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ঘনরাম বাঙ্গালা সাহিত্যে কালী মূর্ত্তির ধ্যান ও কালীর অলৌকিক শক্তির কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কানাড়া রাজরাণী কিন্তু কালীর সেবিকা। কালী তাঁহাকে "যবনের"—(?) বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে উৎসাহ ও অভয় দিতেছেন। ১৬শ শতকেই আমরা কালীর আবির্ভাব দেখিয়াছি। কিন্তু ১৭ দশ শতকের শেষে ও ১৮ দশ শতকের প্রথম হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম্মের আবরণের অন্তরালে কালীর অনুপ্রবেশ বেশী লক্ষ্য করা যায়। ইহাতে বাঙ্গালার তন্ত্রমতে এবং শাক্ত ধর্ম্মে বৌদ্ধ প্রভাব অনুমান ও অনুভব করা অসঙ্গত হইবে না।—সম্পাদক।

২। "ভারতচন্দ্রের ললিতশব্দে মুগ্ধ হইয়া এক সময় বঙ্গীয় যুবকগণ নৈতিক কূপে পড়িয়াছিলেন।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন)

বহিরাবরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। ভারতচন্দ্রের কালী ও শিবের রূপ বর্ণনায় ছন্দ ও শব্দ ঝঙ্কারের পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। কিন্তু ভাব ও ছন্দে মাখামাখি হইয়া কল্পকলা রূপান্তরিত হইয়া ভাগবত সত্যে উপনীত হইতেছে ইহা ভারতচন্দ্রে নাই তাহা নয়, তবে অতি অল্প। রামপ্রসাদের কালীর রূপ বর্ণনাবহুল অনেকগুলি সঙ্গীত—এইরূপে ভারতচন্দ্রের কল্পকলার রাজ্যকে ছাড়াইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই। বরং ছন্দ ও শব্দ ঝঙ্কারে যেখানে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে দণ্ডায়মান—সেখানে অনেক স্থানেই রামপ্রসাদ হইতে ভারতচন্দ্রই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কাব্য ত শুধু ছন্দ আর শব্দ ঝঙ্কার নয়। কাজেই ভারতচন্দ্রের কাব্যের রাজ্য হইতে রামপ্রসাদের কাব্যরাজ্যের পরিসর অনেক উচ্চে—দূরে অবস্থিত ও বিস্তৃত। কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের বাঙ্গালী নিশ্চিতই এ কথা জানিত। কিন্তু আমাদের আজ এ কথা আবার নূতন করিয়া বলিতে ও শুনিতে হইতেছে।

ভারতচন্দ্র—কালী, তারা, রাজরাজেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা মূর্ত্তির শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বর্ণনা দ্বারা তাঁহার অনুপম 'অন্নদামঙ্গল' আরম্ভ করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের কালী—

লোল জিহ্বা রক্তধারা মুখের দুপাশে
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে।

ভারতচন্দ্রের শিব—

লক্ লক্ ফণী জটা বিরাজ, তক্ তক্ তক্ রজনী রাজ
ধক্ ধক্ ধক্ দহন সাজ, বিমল চপল গঙ্গিয়া।

ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন লোল, হুহু হুহু হুহু যোগিনী বোল
কুলু কুলু কুলু ডাকিনী রোল প্রমদ প্রমথ সঙ্গিয়া।

ইত্যাদি,

—অথবা—

মহারুদ্ররূপে, মহাদেব সাজে, ভভম্ভম ভভম্ভম
শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা, ছলচ্ছল টলট্টল
কলকল তরঙ্গা॥
ধক্ ধ্বক্ ধক্ ধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে, ববম্বম ববম্বম
মহাশব্দ গালে
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে অরেরে অরে দক্ষ
দেরে সতীরে॥

এই শাক্ত সাহিত্যের ধারাকে অনুসরণ করিয়া যদি আমরা ষোড়শ শতাব্দীর একজন কবির কাব্যরাজ্যে প্রবেশ করি—তবে দেখিতে পাই যে, শিবের রূপ বর্ণনায় যে ছন্দ ও শব্দ বিন্যাসের পারিপাট্য তাহা ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বগামী হিসাবেও গৌরব-ব্যঞ্জক। কবি গোবিন্দদাসের কালিকা মঙ্গলের (১) অন্তর্ভুক্ত বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থে শিবের এইরূপ রূপবর্ণনা আছে। যথা—

(১) "আমরা যে সমস্ত বিদ্যাসুন্দর পাইয়াছি, তন্মধ্যে ১৫৯৫ খৃঃ অব্দে বিরচিত কায়স্থ কবি গোবিন্দ দাস কৃত কালিকা মঙ্গলের অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দর প্রসঙ্গই প্রাচীনতম। * * ভারতচন্দ্র রায় এক শতাব্দীর পরবর্ত্তী লেখক হইলেও তদীয় গ্রন্থের প্রভাব ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দরের উপর বিস্তারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়

সুর নদী চন্দ্রিম মুকুট মাল ভূষণ ফণিমাল
কুন্তল সোহে শ্রুতি।
টলমল ত্রিনয়ন জ্বলে আধ মিলন রজত
ধরাধর অঙ্গ দ্যুতি॥

আর একটা—

নৌমি নন্দি কেশ ঈশ, কণ্ঠে কাল কূট বিষ,
নীলকণ্ঠ নাম রাম দেব দেব বন্দিনী
অৰ্দ্ধ অঙ্গ গৌরী সঙ্গ,—মৌলি কেলি চতুরঙ্গ
অৰ্দ্ধ ভঙ্গ অতিরঙ্গ সোহে জহ্নু নন্দিনী!
রঙ্গনাথ লোক পাল অৰ্দ্ধ অঙ্গ বাঘছাল
ব্যোমকেশ শেষমাল ভালে ইন্দু মোহিনী।

না। *** বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বহু পূর্ব্ব হইতে এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল। হিন্দু লেখকগণ উহা ধর্ম্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাখিয়া চণ্ডীকাব্যের ন্যায় উহাতেও দেবমাহাত্ম্য-জ্ঞাপক উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন। ** ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী আর দুইখানি বাঙ্গালা বিদ্যাসুন্দর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ভারতের পদলালিত্য ও অপূর্ব্ব শব্দমন্ত্র নাই, কিন্তু দোষগুলি সমধিক পরিমাণে বিদ্যমান। এই দুইখানি বিদ্যাসুন্দর প্রণেতা কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ। প্রাণরাম নামক এক কবি ভারতচন্দ্রের পর আর একখানি বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই কয়েকটী কথা আছে—বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম বিকাশ। বিরচিত কৃষ্ণরাম নিমতা যার বাস॥ তাঁহার রচিত পুথি আছে ঠাঁই ঠাঁই। রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা নাই॥ পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদা মঙ্গলে। রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে।"

[বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন]

এই প্রসঙ্গে রামপ্রসাদের শিবের রূপ বর্ণনার একটা সঙ্গীত উদ্ধার করিতেছি।

হর ফিরে মাতিয়া শঙ্কর ফিরে মাতিয়া।—
শিঙ্গা করিছে ভভ ভম ভম ভো ভো ভো ববম ববম
বব বম বব বম গাল বাজিয়া।
মগন হইয়া প্রমথনাথ, খেটক ডমরু লইয়া হাত
কোটী কোটী দানব সাথ শ্মশানে ফিরিছে গাইয়া
কটিতটে কিবা বাঘের ছাল, গলায় দুলিছে
হাড়ের মালা
নাগ যজ্ঞোপবীত ভাল, গরজে গর্ব্ব মানিয়া।

* * *

শব আভরণ গলায় শেষ দেবের দেব যোগিয়া।
বৃষভ চলিছে খিমিকি খিমিকি
বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি
ধরত তাল দ্রিম্‌কি দ্রিম্‌কি, হরিগুণে হর নাচিয়া,
বদন ইন্দু, ঢল ঢল ঢল, শিরে দ্রবময়ী করে টল টল
লহরী উঠিল কল কল কল জটাজুট মাঝে থাকিয়া।

রামপ্রসাদের কল্পকলা এখানে তাঁহার পূর্ব্বগামী ও সমসাময়িক কবিদের কল্পকলার সমান আসন মাত্র দাবী করিতেছে। রামপ্রসাদের কালীর রূপ-বর্ণনার সঙ্গীতগুলি উদ্ধার করিতেছি—

১। এলোকেশে, কে শবে, এলোরে বামা ?

২। সমরে কেরে কালকামিনী ?

কাদম্বিনী বিড়ম্বনী, অপরা কুসুমা পরাজিতা বরণী

কে রে রমণী ?

৩। ও কার রমণী সমরে নাচিছে

দিগম্বরী দিগম্বরোপরে শোভিছে।

৪। সমর করে ও কে রমণী ?

রণোন্মত্তা রুধিরাপ্লুতা এই কালী মূর্ত্তিকে রামপ্রসাদ পূর্ব্বোদ্ধৃত সঙ্গীতগুলিতে যেরূপে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কল্পকলার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কল্পকলার অপরিণত অবস্থারও সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর—

১। ও কেরে মনোমোহিনী

ঐ মনোমোহিনী

ঢল ঢল ঢল তড়িৎ ঘটা মণি মরকত কান্তিছটা—

২। হের কার রমণী নাচেরে ভয়ঙ্করা বেশে

কে রে নবনীল জলধর কায় হায়, হায়

কে রে হরহৃদি হৃদ্‌পদে দিগবাসে ?

৩। ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে

গলিত চিকুর আসব আবেশে।

৪। নবনীল নীরদ তনুরুচিকে ?

৫। আরে ঐ আইল কেরে ঘনবরণী।

কেরে নবীনা নগণা লাজ বিরহিতা ভুবন মোহিতা

একি অনুচিতা কুলের কামিনী।

কুঞ্জরবরগতি আসব আবেশ
লোলিত বসনা গলিত কেশ
সুর নর শঙ্কা করে হেরি বেশ
হুঙ্কার রবে রে দনুজ-দলনী

* * * *

বামে অসিমুণ্ড দক্ষিণে বরাভয়
খণ্ড খণ্ড করে রথ গজ হয়,—
জয় জয় ডাকিছে সঙ্গিনী।

৬। ওকে ইন্দীবর নিন্দি কান্তি, বিগলিত বেশ
বসন বিহীনা কে রে সমরে—।

৭। ঢল ঢল জলদ বরণী এ কার রমণী রে ?

৮। মা, কত নাচ গো রণে ! (২)

[খাম্বাজ—রূপক]

(২) মা ! কত নাচ গো রণে !
নিরুপম বেশ বিগলিত কেশ
বিবসনা হর-হৃদে কত নাচ গো রণে !
সদ্য-হত-দিতি-তনয়-মস্তক-হার-লম্বিত
সুজঘনে কত রঞ্জিত কটিতটে
নর-কর-নিকর কুণপ শিশু শ্রবণে ॥
অধর সুললিত বিম্ব বিনিন্দিত
কুন্দ বিকশিত সুদশনে।
শ্রীমুখমণ্ডল, কমল নিরমল, সাট্ট হাস সঘনে
সজল জলধর, কান্তি সুন্দর
রুধির কি বা শোভা ও বরণে।

রামপ্রসাদ এই শ্রেণীর সঙ্গীতগুলিতে—সাধনের প্রথম অবস্থায় সমসাময়িক কবিদের অনুসৃত পদলালিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া কালীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

সাধনের প্রথম অবস্থায় সাধকের দৃঢ় সংকল্পের একান্ত প্রয়োজন। সাধক মাত্রেই তাহা জানেন। তাই রামপ্রসাদ বলিতেছেন—আমি আর অসময়ে কোথায় যাব? মায়ের চরণ

প্রসাদ প্রবদতি, মম মানস নৃত্যতি
রূপ কি ধরে নয়নে।

KALI, THE BATTLE-QUEEN

Ever in battle dancing, Mother. Never
Beauty like thine, as, with flowing hair,
Naked, a warrior, on Siva's breast thou dancest;
Around thy neck hung as a garland there
Heads of thy sons, killed freshly daily;
Thy ear-rings little children are.
Thy waist adorned with hands; thy lips so lovely:
Thy teeth as Kunda flowers in blossom are.
Thy face is bright even as the lotus-flower,
Its constant smiling terrible. And fleet
In beauty as the rain cloud is thy figure
And stained with blood all over are thy Feet.
Prasad says: "As the dancer is my mind.
Such beauty to behold my eyes doth blind."

"Bengali Religious Lyrics"—Sakta.
Selected and translated by Edward J
Thompson and Arthur Murshman Spencer.

তলেই পড়ে রব ! মা যদি আর জায়গা না দেয় তবে না হয় বাহিরেই পড়ে থাকবো, তাতেই বা ক্ষতি কি ? আমি মায়ের নাম ভরসা করে উপবাসী হয়ে পড়ে থাকবো—দেখি মায়ের দয়া হয় কিনা। মা যদি আমায় তাড়িয়ে দেয়—আমি দুহাত বাড়িয়ে চরণ তলে পড়ে এ ছার প্রাণ পরিত্যাগ করবো।

মায়ের চরণ তলে লব স্থান লব
আমি অসময়ে কোথায় যাব। ইত্যাদি

এইখানে সাধনায় ও কল্পকলায় রামপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছে।

তারপর যখন সাধন পথে এই দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া তিনি অগ্রসর—তখন পথ দেখিতে দেখিতে একদিন তিনি কালীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে—যে বাসনা মনে করিয়া অগ্রসর হইলাম—তার ত কোনই চিহ্ন দেখা যায় না, আমায় দয়া হবে কি না-হবে ঠিক ঠিক বলিয়া দাও—

এলোকেশী দিগ্‌বসনা
কালী পুরাও মনোবাসনা
যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশমাত্র নাহি দেখি,
আমায় হবে কি না-হবে দয়া
ব'লে দে মা ঠিক ঠিকানা।

ইহাও সাধনের একটী অবস্থার কথা। সাধন-পথের এই গানে রামপ্রসাদ ক্রমশঃ তাঁহার সমসাময়িক কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের

লিপিচাতুর্য্য পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়া নিজের সহজ সরল স্বাভাবিকতার মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে চলিয়াছেন। (১)

---

(১) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ১৩২৩ সাল পৌষ মাসে বাঁকিপুর অভিভাষণে 'রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র' সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন 'ভারতী' সম্পাদক ১৩২৩ সালের মাঘ সংখ্যায় তাহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণচন্দ্রের যুগকে ও ভারতচন্দ্রকে রাজার পৃষ্ঠপোষিত বলে তাচ্ছীল্য করে লেখক বলেছেন 'তাহার পর কোন শুভ মুহূর্ত্তে রামপ্রসাদের জন্ম হইল।'—এই 'তাহার পর' কথা দুটি দেখে বোঝা যাচ্ছে, লেখক রামপ্রসাদকে কৃষ্ণচন্দ্র যুগের পরের কবি বলে ধরেছেন। কিন্তু তা নয়, রামপ্রসাদ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ না হইলেও, তাঁহার দ্বারাই পৃষ্ঠপোষিত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই রামপ্রসাদকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি ও নিস্কর একশো বিঘা ভূমি দিয়াছিলেন, এমন কি রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর'ও ভারতচন্দ্রের আগেও কৃষ্ণচন্দ্রের নামেই উৎসর্গ করা।"

ভারতী সম্পাদকের এই সমালোচনার উত্তরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (গ্রন্থকর্ত্তা—রামপ্রসাদ) কে লিখিয়াছেন—"আমার বাঙ্গালার গীতি কবিতা প্রবন্ধে আমি রামপ্রসাদকে পৃথকভাবে আলোচনা করি নাই, চণ্ডীদাস হইতে বাঙ্গালার কবিওয়ালারা পর্য্যন্ত গীতি কবিতার যে ধারা আছে সেই ধারার বিষয় লিখিয়াছি।' এই প্রবন্ধে রামপ্রসাদ আগে কি ভারতচন্দ্র আগে এরূপ কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না, আমার বিশ্বাস তাঁহারা দুজনেই সমসাময়িক, ২।৪ বৎসর এদিক ওদিক হইতে পারে। কিন্তু দুইজন কবি সমসাময়িক হইলেও দুইটী ভিন্নযুগের হইতে পারে, আমার বক্তব্য বিষয় এই ছিল যে বাঙ্গালার গীতি কবিতার ধারায় ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ ভিন্ন যুগের; মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী যুগে বাঙ্গালার গীতি কবিতার সৌন্দর্য্য ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল—তাহারই শেষফল ভারতচন্দ্রের গীতি কবিতা, প্রসাদের গানে নব জাগরণ এবং সেই জন্যেই একটা নবযুগের বারতা পাওয়া যায়।" (রামপ্রসাদ—শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৬৯ পৃষ্ঠা)

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ এই দুই কবি একই যুগের না দুইটি বিভিন্ন

যখন এইরূপ নামজপ ও রূপ ধ্যান করিতে করিতে—সাধকেরা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে থাকেন—তখন সাধনের বিঘ্নগুলি একে একে তাঁহাকে এড়াইয়া যাইতে হয়। কৃষ্ণচন্দ্রের প্রদত্ত একশত বিঘা নিষ্কর জমি রামপ্রসাদ গ্রহণ করিলেও তিনি ভারতচন্দ্রের মত রাজার সভাকবি হইবার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন।

যুগের ?—৬৫ বৎসর আগে ১৮৭৩ খৃঃ রামগতি ন্যায়রত্ন এই প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন। (বাঃ ভাঃ ও বাঃ সাঃ বিষয়ক প্রস্তাব—পৃঃ ১৬৯। ৩য় সংস্করণ) ন্যায়রত্ন মহাশয় রামপ্রসাদকে মধ্যকালের সর্ব্বশেষ এবং ভারতচন্দ্রকে ইদানীন্তন কালের সর্ব্বপ্রথম বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। রামপ্রসাদের কালকে,—মধ্যকাল ও ইদানীন্তন কালের "সন্ধিস্থল" বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"রামপ্রসাদের রচনাতেও প্রাচীন কবিদিগের ন্যায় মিলের দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা মরি—হই, কি—ঝী থো—স্থো, ইত্যাদি। এই মিল দোষ জন্যই রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক হইলেও, ইঁহাকে (রামপ্রসাদকে) আমরা মধ্যকালের শেষে, এবং ভারতচন্দ্রকে ইদানীন্তন কালের প্রথমে স্থান দিলাম—নচেৎ ইঁহাদিগকে এক স্থানে বসাইলেই চলিত।"

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন—এক কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের মোটা চাদরের আবরণে—এই দুই কবিকে ঢাকিয়া দিয়াছেন। ইঁহারা উভয়ে একই যুগের কবি, ইহাই দীনেশবাবুর অভিমত। এই অভিমতে কোন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ নাই।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলিতেছেন,—ইঁহারা দুইটি ভিন্ন যুগের কবি। তাঁহার কথা অতিশয় সুস্পষ্ট—"দুইজন কবি সমসাময়িক হইলেও দুইটি ভিন্ন যুগের হইতে পারে।" এখানে চিত্তরঞ্জন,—রামগতির সহিত একমত এবং দীনেশবাবুর মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু আবার রামগতির সহিতও চিত্তরঞ্জনের মতের সুস্পষ্ট অনৈক্য রহিয়াছে। চিত্তরঞ্জন বলিতেছেন রামপ্রসাদে একটা নবযুগের বারতা পাওয়া যায়। এবং ইহা কৃষ্ণচন্দ্রীয় ভারতচন্দ্রের যুগকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। যুগ হিসাবে রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের আগে নয়—পরে। সম্পাদক।

মায়ের নিকট 'নুন মিলেনা আমার শাকে' বলিয়া আতুরে ছেলের (১) মতন অভিমান করিয়াছেন, তেমনি গাহিয়াছেন—

কাজ কি মা সামান্য ধনে

ও কে কেঁদেছে গো তোর ধন বিহনে।

সামান্য ধন দিবে তারা, পড়ে রবে ঘরের কোণে

যদি দেও মা আমায় অভয়চরণ রাখি হৃদি পদ্মাসনে।

তারপর ষড় রিপুর সহিত দ্বন্দ্ব। মনের সহিত বোঝাপড়া। এগুলিও সাধন পথেরই গান। সাধক একবার মনকে বুঝাইতেছেন, আবার অবুঝ মনের সহিত গোঁসা করিতেছেন, আবার কখনও বা মনের বিরুদ্ধে মায়ের নিকট নালিশ করিতেছেন—।

১। মনরে তোর চরণ ধরি

কালী বলে ডাকরে ওরে ও মন—

২। মন জান নাকি ঘটবে লেঠা

আমি দিন থাকিতে উপায় বলি

দিনের সুদিন যেটা

2—"The great burden of his verses is the Mother. And in calling upon her he becomes the ideal child.

It is curious to reflect how a century and a half ago, almost a hundred years before the birth of childhood into European art, a great Indian singer and saint should have been deep in observation of the little ones—studying them, and sharing every feeling, almost without knowing it himself.

(—By the Sister Nivedita—
Two saints of Kali—P. 52)

৩। মন তুমি দেখরে ভেবে
ওরে আজি অব্দ শতান্তে বা অবশ্য
মরিতে হবে

৪। মন হারালি কাজের গোড়া
তুমি দিবানিশি ভাব বসি
কোথায় পাব টাকার তোড়া।
টাকি কেবল ফাঁকি মাত্র
শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া
তুই কাচমূলে কাঞ্চন বিকালি
ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া।

৫। মনরে তোর বুদ্ধি এ কি?

৬। মনরে আমার এই মিনতি
তুমি পড়া পাখী হও করি স্তুতি
উড়ে উড়ে বেড়ে বেড়ে বেড়িয়ে কেন
বেড়াও ক্ষিতি?

৭। মন কালী কালী বল—

৮। তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন
ওরে আমার শুয়া পাখী
আমারি অন্তরে থেকে আমারে দিতেছ ফাঁকি

৯। আয় দেখি মন তুমি আমি
দুজনে বিরলেতে বসি রে।

১০। মনরে কৃষি কাজ জান না (৩)

এমন মানব জমিন রৈল পতিত

আবাদ করলে ফলতো সোনা।

তারপর মনের সঙ্গে গোঁসা করিতেছেন—

প্রসাদী সুর—একতালা।

মনরে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলতো সোনা।
কালীর নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরুপ হবেনা,
সে যে মুক্তকেশীর (মনরে আমার) শক্ত বেড়া,
তার কাছেতে যম ঘেঁসে না।
অদ্য অব্দ-শতান্তে বা বাজেয়াপ্ত হবে জান না;
এখন আপন ভেবে, (মনরে আমার) যতন করে
চুটিয়ে ফসল কেটে নে না।
গুরু রোপন করেছেন বীজ, ভক্তি বারি তায় সেচনা
ওরে একা যদি (মনরে আমার) না পারিস মন,
রামপ্রসাদকে ডেকে নেনা।

THE WATER OF LOVE

Knowest not, mind, to farm? In the untilled
field
Would golden harvest wave, so thou hadst
sown,
Make of her name a fence, that so the yield
Be not destroyed. Not Death himself, O Mind,
Dare come nigh Kali of the tresses free.
When forfeiture will come is all unkown

১। ভাল নাহি মোর কোন কালে,
ভালই যদি থাকবে আমার মন কেন
কুপথে চলে ?

২। নিতি তোরে বুঝাবে কেটা
বুঝে বুঝলি নারে মনরে ঠেঁটা
কোথায় র'বে ঘর বাড়ী তোর
কোথায় র'বে দালান কোঠা ?*

আবার মনকে বুঝাইতেছেন—

১। আয় দেখি মন চুরি করি তোমায় আমায়
একত্তরে
শিবের সর্ব্বস্ব ধন মায়ের চরণ যদি আনতে
পারি হ'রে।

To-day or after many a century.
Lo, to thy hand the present time, O Mind,
Haste thou, and harvest. What they gave to
thee.
The seed thy teachers gave, scatter it now.
With water of love it sprinkle. If alone,
O Mind, thou canst not this accomplish, thou
Alone, take Ramprasad to be with thee.

"Bengali Religious Lyrics—Sakta *
Selected and translated by Edward J
Thompson and Arthur Marshman Spencer.

২। সামাল ভবে ডুবে তরী
ও মন, তুমি পরের ঘরের হিসাব কর
আপন ঘরে যায় যে চুরি।

পুনরায় দুঃখিত চিত্তে মায়ের নিকট নালিশ করিতেছেন

১। ও মন তোর নামে কি নালিশ দিব
ও তুই শকার বকার বলতে পারিস্
বলতে নারিস্ দুর্গা শিব ?

মাকে বলিতেছেন—

১। দুঃখের কথা শুন মা তারা
আমার ঘর ভাল নয় পরাৎপরা
যাদের নিয়ে ঘর করি মা—
তাদের এম্নি কাজের ধারা
ও মা পাঁচের আছে পাঁচ বাসনা
সুখের ভাগী কেবল তারা

* * *

ঘরের কর্ত্তা যে জন স্থির নহে মন
ছ'জনেতে কল্লে সারা।

৩। ভূতের বেগার খাটিব কত ?
তারা, বল আমায় খাটাবি কত ?
আমি ভাবি এক হয় আর
সুখ নাই মা কদাচিত
পঞ্চদিকে নিয়ে বেড়ায় এ দেহের পঞ্চভূত

*　　　*　　　*

ও মা যার সুখেতে হব সুখী

সে মন নয় গো মনের মত।

৪　মা, আমায় ঘুরাবে কত ? (৪)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা আমায় ঘুরাবে কত।
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত।
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছটা কলুর অনুগত।
মা শব্দ মমতা যুক্ত, কাঁদলে কোলে করে সুত।
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা,
আমি কি ছাড়া জগত।
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে চক্ষুর ঠুলি দেখি শ্রীপদ মনের মত
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন ত।
রামপ্রসাদের এই আশা, মা,
অন্তে থাকি পদানত।

"THE TYRANNY OF REBIRTH"

Mother, how often round the wheel of Being
Me, like a blind ox that grinds the oil
Are you to drive ? Bound to the leg o' the world,
You urge me onward—an incessant toil.
Six oil men rule me—guilty ? Through rebirths
As bird, even eighty lakhs, and beast that's dumb,
Yet still not closed to me the door o' the womb.

কাঞ্চনের মায়া ও ইন্দ্রিয়ের বিক্ষোভ হইতে যে এক সময়ে আত্মরক্ষার প্রয়োজন হয় এই গানগুলিতে সাধক-জীবনের সেই স্তরের কথা বলিতেছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়েব ভোগে, মনের বাসনায়,— ভগবানের লীলা নাই—ইহা শয়তানের খেলা, ইহা পাপ,—এ তত্ত্ব খ্রীষ্টানী তত্ত্ব (১), এ তত্ত্ব রামপ্রসাদের

But, sorely hurt, again, again I come.
The mother takes the child into her lap,
When the child, weeping, utters the Mother's name,
I see this everywhere excepted I ,
Else sinners pardon crying "Durga" gain.
Oh, take this binding from my eyes that I
May see those feet that ever banish fear.
Countless the evil, the evil children are ,
But who did ever of evil mother hear ?
My hope is Ramprasad, O Mother kind,
May at your feet in the end station find.

"Bengali Religious lyrics—" Sakta.
Selected and translated by Edward J.
Thompson and Arthur Marshman Spencer.

১। (ক) "ইন্দ্রিয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কোন ভাব, কোন সত্তা, আজিও মানুষের ভিতরে অনুভব হয়, এমন বিশ্বাস আমার নাই। ইন্দ্রিয় যাঁহার সৃষ্টি, অতীন্দ্রিয়ও তাঁহারই সৃষ্টি। ইন্দ্রিয়কে অস্বীকার করিয়া অতীন্দ্রিয়ের উপর জীবনের কোন ভিত গাঁথা যায় কি? কেহ আজিও পারিয়াছেন কি ?"

[বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭]

(খ) "ইন্দ্রিয়ের সত্য খেলাকে বাঙ্গলা কখনও অস্বীকার করে নাই।

সাধক জীবনে ও কল্পকলায় স্থান পায় নাই। ইহার পরবর্ত্তী অবস্থাতে রামপ্রসাদ বলিতেছেন—

মন গরীবের কি দোষ আছে
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা,
যেম্নি নাচাও তেম্নি নাচে
তুমি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্ম কথা বুঝে গেছে
ও মা তুমি ক্ষিতি তুমি জল
ফল ফলাচ্ছ কলা গাছে
তুমি শক্তি তুমি ভক্তি তুমিই মুক্তি শিব বলেছে
ওমা তুমি দুঃখ তুমিই সুখ চণ্ডীতে তা লেখা আছে
প্রসাদ বলে কর্ম্মসূত্রে যে সূতার কাটনা কেটেছে

বৈষ্ণব জানে যে, তাহার মনে, প্রাণে, দেহে এক অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত লীলা করিতেছে, সে যন্ত্র, যন্ত্রী তাহার প্রাণের প্রাণারাম হইয়া আনন্দ রস লীলাচ্ছলে ভোগ করিতেছেন। এই ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই শুদ্ধি ভোগ ও ভুক্তি প্রতিষ্ঠিত। এ ইন্দ্রিয় ভাগবত ভোগের ইন্দ্রিয়।" * * *

[বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭]

(গ) "খৃশ্চান পাদরীর কাছে বাঙ্গালার ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যের কথা ও পাপ বোধের কথা অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু তাহা বলিয়া কি আমরা আমাদের আদর্শ ভুলিয়া প্রতীচ্যের রঙিন খোলসে পড়িয়া নিজের আত্মাকে অস্বীকার করিয়া সাহিত্য ও ধর্ম্মে আত্মহত্যার গৌরব অর্জ্জন করিব ?"

[বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭]

(ঘ) "আজি কালিকার দিনেও এ সব অলীক খৃশ্চানী নীতিকথার ন্যাকামীতে যাহারা ইন্দ্রিয়ের ভোগকে অশুদ্ধ করিয়া তুলিতে চায়, তাহারা বাস্তবিকই কৃপার পাত্র।" * * * [বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭]

ও মা মায়াসূত্রে বেঁধে জীব,
ক্ষেপা ক্ষেপি খেলা খেলিছে।

কর্ম্মফল, জন্মান্তরবাদের তত্ত্ব—এই গানের কল্পকলায় ফুটিতে চাহিতেছে—কিন্তু আমি এই গানের রূপান্তরে যে কথাটি বুঝাইতে চাই তাহা হইতেছে এই যে—বিশ্বের আদি অন্তে সৃষ্টি প্রবাহে—এই লীলাস্রোতে যা কিছু ঘটিতেছে—সাধক রাম-প্রসাদের দৃষ্টিতে—তা সমস্তই—বাজীকরের মেয়ে শ্যামা মার 'নাচ'। এই বিশ্বনৃত্যই কালীর নৃত্য। বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যই এই নৃত্যের ছন্দে গ্রথিত।* ইহার কোন বৈচিত্র্যই মায়ের চরণাঘাত ভিন্ন জাগে নাই। ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, সমস্তই মায়ের নৃত্যের তালে তালে জাগিয়াছে। মনের প্রত্যেক বাসনাতেই মায়ের নৃত্য চরণ-নুপুর রুনু ঝুনু ধ্বনিত হইতেছে। ইহার একটা পাপ আর একটা অপাপবিদ্ধ বলিয়া লেভেল আঁটিয়া দূরে রাখা—বাঙ্গালার শেষ শক্তিসাধক (১) শেষ শক্তি

১। (ক) "জীবনকে অপবিত্র করে কাহার সাধ্য? জীবের জীবন যে ভগবানের লীলা, সেই লীলাময়ের লীলার উপরে হস্তক্ষেপ করে, এমন অহঙ্কার—এমন দাম্ভিকতা কার?"

[রূপান্তরের কথা ১৯১৭]

[খ] "মানুষের প্রবৃত্তি কি সত্য নহে? মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে কি ভগবানের সাড়া পাওয়া যায় না? আজও কি শ্রী-চৈতন্যের দেশে শুনিতে হইবে যে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের খেলা শয়তানের খেলা? আমরা কি ইংরাজী আমলের প্রথম অবস্থায় যাহা মুখস্থ করিয়াছি, তাহা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না? ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কি অতীন্দ্রিয়ের সন্ধান মিলে না?

[রূপান্তরের কথা ১৯১৭]

গায়ক রামপ্রসাদ সমীচীন মনে করেন নাই! এইখানেই শাক্ত ও বৈষ্ণবের অভেদাত্মা। এইখানেই বাঙ্গালার প্রাণের এক স্বরূপের পরিচয়।

তারপর ক্রমে যখন সিদ্ধির কাছাকাছি গিয়া উপস্থিত হইতেছেন তখন সাধক ও কবি একাত্ম হইয়া যে সাধনা-গানে রূপান্তর করিতেছেন তাহার সত্যই তুলনা নাই। আমি আধুনিক বাঙ্গালার 'অন্ধ আঁখি'কে আবার তা ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে বলি। কেন না ইহা সত্যই 'তিমিরে তিমিরহরা'।

ভবের বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল
কি করবো আর ভবের হাটে
শ্রীরামপ্রসাদ বলে বাঁধরে বুক এঁটে সেটে।
ওরে এবার আমি ছুটিয়াছি ভবের মায়া বেড়ী কেটে।

শ্যামা মা ঘুড়ি উড়াইতেছেন এই ভব সংসার বাজারের মাঝে। "মায়াদড়িতে" সকল ঘুড়িই বাঁধা কিন্তু "ঘুড়ি স্বগুণে নির্ম্মাণ করা।" তথাপি

ঘুড়ি লক্ষে দুটা একটা কাটে
হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।

এইবার রামপ্রসাদ কাটা-ঘুড়ির মত শূণ্যে উধাও ছুটিয়াছেন। (২) তাঁর কল্পকলায় এই তার আভাষ ৴

(গ) "এমন হতভাগ্য কি কেহ আছে যে, তাহার ইন্দ্রিয়ের যে ভোগ, তাহার মধ্যে অতীন্দ্রিয়ের যে ডাক একেবারেই শুনিতে পায় নাই?
[রূপান্তরের কথা ১৯১৭]

(২) শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি।
(ভব সংসার বাজারের মাঝে)
এ যেমন ঘুড়ি, আশা বায়ু, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি।

আর ভুলালে ভুলবো না গো
আমি অভয়পদ সার করেছি
ভয়ে হেলবো দুলবো না গো।

কাক গণ্ডী মণ্ডি গাঁথা, তাতে পঞ্জরাদি নাড়ী।
ঘুড়ি স্বগুণে নির্ম্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি।
বিষয়ে মেজেছে মাজা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।
ঘুড়ি লক্ষে দুটা একটা কাটে,
হেসে দেওমা হাত চাপড়ি।
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি।
ভব সংসার সমুদ্রপারে পড়বে যেয়ে তাড়াতাড়ি।

রামপ্রসাদের সম্পূর্ণ গানটিই উদ্ধৃত করা হইল। এখন এই গানটি সম্পর্কে Sister Nivedita যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহাও তুলিয়া দিতেছি।—

"Quaint beyond quaintness is the song of the kite flying. To the child mind it is quite natural that its mother should play with its toys. All mothers do so. And now Kali becomes the playmate. Her toy is the Indian kite, of which the string is covered with powdered glass that it may cut through others. But the boy forgets his game, so completely is it that She fascinates him. He breaks away and looks on with grave joy at Her, while his lips involuntarily frame a song. It is the game of life that is played before him, the kite released is the soul, gone to freedom, and still the Mother laughs and plays on, and as if She know not that all these were shadows :—"

"In the market place of this world,
The Mother sits flying Her kite.
In a hundred thousand,
She cuts the string of one or two.

বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে উল্‌ব না গো
সুখ দুঃখ ভেবে সমান মনের আগুণ তুলবো না গো
ধনলোভে মত্ত হয়ে দ্বারে দ্বারে বলবো না গো
মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের গাছে ঝুলবো না গো
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি
ঘোলে মিশে ঘুলবো না গো।

এইবার "ঠিক ঠিকানা" অনেকটা সাধকের করতলগত হইয়াছে। যে মৃত্যু ভয় দেখাইয়া মনকে তিনি কত শাসাইয়াছেন, সেই শমনকে এবার তিনি দূর হইয়া যাইতে বলিতেছেন এবং না গেলে "সোজা" করিয়া দিবেন এমন আভাষও দিতেছেন। কেন না এখন তিনি

ক্ষেমার খাস তালুকের প্রজা
ক্ষেমার খাসে আছি বসে, নাই মহালে শুকোহাজা

এখানে তিনি শ্যামা মাকে কয়েদ করিয়াছেন

And when the kite soars up into the infinite
Oh how she laughs and claps Her hand !"
(By the Sister Nivedita—Two saints of Kali
P 54-55)

প্রবন্ধ লিখিবার সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন Sister Nivedita রামপ্রসাদ সম্পর্কে কোন অভিমত জানিতে পারেন নাই। অথবা Sister Nivedita কর্ত্তৃক রামপ্রসাদের কোন গানের ইংরাজী অনুবাদও তিনি দেখিতে পারেন নাই। যদিও ১৮৯৯—১৯০০ এই এক বৎসর মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা Two saints of Kali প্রকাশ করিয়াছেন। Sister Nivedita রামপ্রসাদের ৫টি মাত্র গানের ভাবার্থ অনুবাদ করিয়াছেন। গানের সম্পূর্ণটা কোথাও তিনি অনুবাদ করেন নাই। সম্পাদক।

১। মন বেড়ি তার পায়ে দিয়ে হৃদ্‌গারদে বসায়েছি
হৃদি পদ্মে বসাইয়ে সহস্রারে মন রেখেছি।
শমনকে স্পষ্ট কেমন বলিতেছেন
২। দূর হয়ে যা যমের ভটা
ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা
বলগে যে তোর যমরাজাকে আমার মতন নিছে কটা
আমি যমের যম হইতে পারি,
ভাবলে ব্রহ্মময়ীর ছটা
প্রসাদ বলে কালের ভটা
মুখ সামলিয়ে বলিস বেটা
কালী নামের জোরে বেঁধে তোরে
সাজা দিলে রাখবে কেটা।
৩। যারে শমন যায়ে ফিরি
ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি ?
৪। ওরে শমন কি ভয় দেখাও মিছে
তুমি যে পদে ও পদ পেয়েছ সে মোরে অভয় দিয়েছে
৫। অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি
আমি আর কি শমন ভয় রেখেছি
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে দুর্গানাম কিনে এনেছি
৬। কালীনামের গণ্ডী দিয়ে আছি দাঁড়ায়ে—
ওরে শমন তোরে কই আমিত আটাশে নই
তোর কথায় কেন রব সয়ে ?
ছেলের হাতের মোয়া নয় যে খাবে হুম্‌কো দিয়ে।

সাধক এইবার আত্মপ্রতিষ্ঠ। তিনি মশারি তুলিয়া নিজের মুখ দেখিয়াছেন। তিনি এবার নিজেকে জানিয়াছেন "ব্রহ্মময়ীর ব্যাটা"। বাঙ্গালী একদিন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও—যে সাধনে নিজেকে ব্রহ্মময়ীর ব্যাটা জ্ঞানে যমরাজকে মুখ সামলাইয়া কথা বলিতে স্পর্দ্ধা করিয়া গিয়াছে—বাঙ্গালীর গানের রূপান্তরে সাধনা শতদলের মত ফুটিয়া রহিয়াছে—তার পরবর্ত্তী যুগের বাঙ্গালীকে সেই সাধন-ভ্রষ্ট কে করিল? (১) গানের রূপান্তরে সেই সরল

(১) ক। "রামপ্রসাদের কিছুদিন পর বাঙ্গলা আবার গানে ভরিয়া উঠিল। কবিওয়ালাদের গানে আবার পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিল। সেই যুগকে বাঙ্গলার গানের যুগ বলা যাইতে পারে।"

[বাঁকিপুর অভিভাষণ ১৯১৬]

(খ) * * * "রামপ্রসাদের পূর্ব্বে কিছুদিন যে আসিয়াছিল তারপর অবিরাম জলোচ্ছাসের মত গান আসিতে লাগিল।"

[বাঁকিপুর অভিভাষণ ১৯১৬]

(গ) "বাঙ্গলার মধ্যযুগে 'গানের যুগে' এই বিচিত্র ভাব সম্পদের কথা আমি এই খানেই শেষ করিলাম। তারপর অন্ধঘন মসীময় আকাশ—আর নাই। বাঙ্গলায় প্রতীচ্যের নব আগমনে, তাহার আলোকে, তাহার বুকের সলিতা শুখাইয়া গেল, বাঙ্গলার দীপ নিভিয়া আসিল।"

[বাঁকীপুর অভিভাষণ ১৯১৬]

(ঘ) "রামপ্রসাদের পর বাঙ্গলায় আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে নাই।"

(বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭)

(ঙ) "তাহারই মধ্যে বাঙলার যে শান্তি, পর্ণকুটীরে বসিয়া বিশ্বসৃষ্টিকে করতলস্থ আমলকবৎ ধরিয়া রাখিয়াছিল, সে শক্তি—সামর্থ্য হারাইল কেন? সে আদর্শ কেমন করিয়া এই ফেরঙ্গ যুগ নষ্ট করিল, তাহাই ভাবিবার কথা।"

(বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭)

স্বাভাবিক সুর—কিসের কৃত্রিমতায় ডুবিয়া গেল—? সাহিত্য জীবন ও সাধনায় এ ব্যবচ্ছেদ কেন হইল? আজ শতমৃত্যু ভয়ে ভীত বাঙ্গালী কেন মুখ তুলিয়া চাহিবার সাহস পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিল? আমায় বলিয়া দাও কোন্ বিশ্বের সহিত সঙ্গমে তার কপালে ইহা ঘটিল? অন্ধকার বিশ্বের অন্ধতম কোণে বাঙ্গালা সাহিত্য এতদিন নাকি ধুকিয়া মরিতেছিল। আজ শতবর্ষ তার উপর দিয়া উদার বিশ্ব সাহিত্যের আলোক চম্‌কিয়া গিয়াছে। কূপের ভেক সাগরে পড়িয়াছে। ইহা কি সত্য? আজ বাঙ্গালায় যে অন্ধকার—সাহিত্যে, জীবনে ও ধর্ম্মে, আজ বাঙ্গালায় যে প্রাচীর ঘেরা অন্ধকূপের সৃষ্টি—বাঙ্গালার ইতিহাসের পাতা এক এক করিয়া ছিঁড়িয়া আমাকে দেখাও—তার কোন্ পাতায় বাঙ্গালীর এ কলঙ্ক এমন গভীর রেখাপাত করিয়াছে ?

আপনারা আমাকে যত ইচ্ছা গালি দিন—কিছু আসে যায় না। (১) আমার 'প্রাণ বুঝেছে মন বুঝে না'—তাই একথা আপনাদিগকে পুনঃ পুনঃ আমাকে বলিতেই

১। Editorial Notes—

"Did Rammohan strike a different note ?—The critic in the Narayana says

রামমোহন আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গলার সাহিত্য, ধর্ম্মগান রামপ্রসাদের সুরে তাঁহার আদর্শে মাতিয়া উঠিয়াছিল।

বাঙ্গলার শাক্ত রামপ্রসাদের প্রেম-ভক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাপ্রভুর ভক্তির ধারা, বাঙ্গলার প্রাণের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন নয়।

হইবে। যাঁহারা বাঙ্গালাকে এ যুগে বিশ্বের সাগর সঙ্গমে লইয়া গিয়াছেন বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেছেন—আমি তাঁহাদের কথা বুঝিতে পারি না। বাঙ্গালাতে বসিয়া—একদিন যার সাধনা ও কার্য্য বাঙ্গালীকে 'ব্রহ্মময়ীর ব্যাটা' এই উপলব্ধিতে পৌঁছাইয়া দিয়াছে,—সেই বাঙ্গালী সাধক—সেই বাঙ্গালী কবিই আমার নিকট বিশ্বকবি। কেন না তাঁর কাব্যে, তাঁর সাধনায়—বিশ্ব যিনি, বৈশ্বানর বিরাট যিনি, তিনি উপহৃত হইয়াছেন। ইংরেজ আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া বাঙ্গালার কবি বিশ্বকবি (২) হইতে

২। Did Rammohan strike a different note then as the critic would have us believe ? The answer will be best given in the words of Dinesh Chandra Sen. The eminent literary critic says in his বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্য P. 623.

Mr. Sen quotes lines from Ramprasad's songs to show that they are fit to be placed side by side with the lines quoted from Rammohan's *Brahma-sangit* or hymns, and he ends by saying that the note that died out on the lips of Ramprosad again re-appeared in Rammohan to move the generation that came after. Undoubtedly Dinesh Chandra is a surer guide than any mere adventurer in the field of Bengali literature.—The Indian Messenger 1898, March 10.

এই সমালোচনাকে উল্লেখ করিয়াই চিত্তরঞ্জন বলিতেছেন "আপনারা আমাকে যত ইচ্ছা গালি দিন। কিছু আসে যায় না।—সম্পাদক।

পারিয়াছেন। রামপ্রসাদের গীতি-কবিতার আলোচনায় আমি তাহাই বলিতে চাই।

কালীর বাহিরের রূপবর্ণনার প্রসাদী সঙ্গীতগুলিকে আমি কৃষ্ণচন্দ্রীয় শব্দযুগের কাব্য বলিয়া ভারতচন্দ্রের গীতি-কবিতার সহিত তুলনা করিয়া আসিয়াছি। এমন কি এই স্তরে অনেক দিকে রামপ্রসাদ অপেক্ষা ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না—তাহাও বলিয়াছি। কিন্তু সাধনের ধাপে ধাপে উঠিতে গিয়া যখন কালীকে বাহির ছাড়িয়া অন্তরে দেখিতে লাগিলেন—তখন তাঁহার কাব্যে যে রূপান্তর ঘটিতে লাগিল—তাহা ভারতচন্দ্রের কাব্যলোককে অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ ও তার পূর্ব্বে ও পরের কত যুগকে একসঙ্গে গ্রথিত করিয়া ফেলিল—গ্রথিত করিয়া বাঙ্গলার গান—বাঙ্গালীর জাতীয় চিত্তকে কোন্ ঊর্দ্ধে লইয়া গেল। কাব্যের এই অভূতপূর্ব্ব রূপান্তর বস্তুতই বিস্ময়াবহ।

আমার বাঙ্গলার শ্যামল শ্রী। পায়ের তলে এই কচি সবুজ ঘাস,—মাথার উপর ঐ আকাশের নীলিমা—ইহার মধ্যে বসিয়া—

১। নবনীলনীরদ তনুরুচি কে

২। কে রে নবনীল জলধর কায়—হায় হায়.

আমার মায়ের এই ছবি রামপ্রসাদ আঁকিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু এবার যে বাহির হইতে অন্তরে আসিয়া উদয় হইতেছেন—সমস্ত দেহে, মনে প্রাণে, সাধক মায়ের আবির্ভাব

অনুভব করিতেছেন। আপনারা বোধ হয় মায়ের এই আবির্ভাব পর্য্যন্তই স্বীকার করিবেন। কিন্তু আমি বলিব সাধকের নিকট মা সাক্ষাৎ মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া দেখা দেন। এ কথা লইয়া তর্ক বৃথা। ইহা লইয়া কেহ তর্ক করে না। আমিও করিব না। * *

বাঙ্গালীর গানে দেহতত্ত্ব-মূলক এক শ্রেণীর গান আছে। চণ্ডীদাসেও আছে—রামপ্রসাদেও আছে। দেহ শয়তানের,—আর, আত্মা ভগবানের—ইহা পাদ্রীরাই এ যুগে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। ইহা বাঙ্গালার সাধনার কথা নয়,—শাক্তেরও নয়, বৈষ্ণবেরও নয় (১), কাজেই যেমন বৈষ্ণব পদাবলীতে তেমনি শ্যামা সঙ্গীতে—দেহের প্রতি অঙ্গে অঙ্গে ইষ্টদেবদেবীর অনুপম লীলা-মাধুর্য্য প্রথম আস্বাদিত হইয়া পরে কাব্যে ও গানে রূপান্তরিত হইয়াছে।

'মাতৃভাবে' রামপ্রসাদ তত্ত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেহতত্ত্বে ও সাধন প্রণালীতে যে আভাস ও ইঙ্গিত আমরা পাই,—চণ্ডীদাসেও ঠিক তাহাই দেখিয়া আসিয়াছি! কেন এরূপ হয়? চণ্ডীদাস রামপ্রসাদ ভিন্ন নয় এক। বাঙ্গালার একই স্বরূপ হইতে ইহাদের জন্ম।

১। (ক) পৃঃ ৭১, ৮২, ১২৭। (বগুড়া অভিভাষণ। ১৯১৭)।

(খ) আমরা জীবনটাকে, টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাগ করিতে শিখি নাই, আমাদের ধর্ম্ম জীবনের কোন একটা বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না।" (রূপান্তরের কথা ১৯১৭)

রামপ্রসাদ বাহির ছাড়িয়া এবার হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে ডুব দিতে চলিলেন—। এক ডুবে কুলকুণ্ডলিনীর কূলে গিয়া উঠিলেন। এইবার প্রাণের খেলা—এইবার অন্তরঙ্গ সাধনা। আমরা দেখিব কল্পকলায় তার কি রূপ বিকাশ হইয়াছে।

•

রামপ্রসাদ অগাধ জলে ডুব দিয়া গাহিয়া উঠিলেন—

কে জানে গো কালী কেমন
ষড়দর্শনে না পায় দরশন।

কালী পদ্মবনে হংসসনে হংসীরূপে করে রমণ
তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে, সদাযোগী করে মনন।
আত্মারামের-আত্মাকালী প্রমাণ প্রণবের মতন
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন
মহাকালে জেনেছেন কালীর মর্ম্ম, অন্য কেবা জানে তেমন।
প্রসাদ হাসে, লোকে ভাবে, সন্তরণে সিন্ধু গমন
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন।

কেবল মহাকাল কালীর মর্ম্ম বুঝিয়াছেন, জীব—শিব না হইলে এই কালীর মর্ম্ম তেমন বুঝিবে না। প্রাণের যে অনুভূতি এই গানের রূপান্তরে ফুটিতেছে—যে দেহতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, বিশ্বতত্ত্ব ও পরমার্থতত্ত্ব—একসঙ্গে কল্পকলার রূপান্তরে প্রকট হইতেছে—তাহার কাছে ষড়দর্শনের ও শাস্ত্রবিদ্যার

অসার তর্ক—আমি আবার বলি, 'গোষ্পদের সঙ্গে তুলনীয়' (১) এই সমস্ত তত্ত্বের বিশ্লেষণে আমি হস্তক্ষেপ করিব না। কেন না আমার তাহাতে অধিকার নাই। কথার দ্বারা ইহার বিশ্লেষণ ও সমীকরণ হয় না। ইহা সাধনের অঙ্গীভূত। সাধন ব্যতিরেকে, দীক্ষা ব্যতিরেকে, গুরুর কৃপা ব্যতিরেকে ইহার ঠিক ঠিকানা মিলিবে না।* * বাঙ্গালী আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা মহলের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই মণিকোঠার পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই মণিকোঠার চাবি যাহাদের হাতে ছিল—আজ তাহারা কে জানে কোথায় গা ঢাকা দিয়াছে। আমি ইহার খবর জানি না। আপনাদের যদি চিত্তশুদ্ধি হয়, মন মুখ এক হয়,—কাপট্য, শাঠ্য ও জাড্য দোষ দূর হয়, তবে আবার হয়ত একদিন মা কৃপা করিয়া—এই বিশ্বের বিদ্যালয়ের পথে পথভ্রান্ত বাঙ্গালীকে আবার তাঁর মন্দিরের মণিকোঠার দিকে ডাকিবেন। পঞ্চবটী তলে যে সাধক সে দিন আসিয়াছিলেন—সেই মায়ের পূজারীকে আবার তিনি পাঠাইবেন। আমি বাঙ্গালীর গানের কথা, কল্পকলা ও তার রূপান্তরের কথা বলিতে বসিয়াছি। কেবল তাহাই বলিব।

১। "রামপ্রসাদের গানের ভিতর প্রেমের, মানুষের রূপান্তর হইয়াছিল, তাহার কাছে বিশ্বের দর্শনাদি প্রতিপাদ্য গ্রন্থের বোঝা ও জ্ঞান গোষ্পদের তুল্য।"— (বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭)

"আমি আবার বলি গোষ্পদের সঙ্গে তুলনীয়।"—কেননা বগুড়া অভিভাষণে ইহা তিনি একবার বলিয়াছেন কাজেই আবার বলি—এই কথা বলিতে হইতেছে। সম্পাদক।

আমি তত্ত্বমূলক গানগুলির দুই চারিটী উদ্ধার করিতেছি।

১। দিবানিশি ভাবরে মন অন্তরে করালবদনা
মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে, মন জাননা।
সদা পদ্মবনে হংসীরূপে আনন্দে সে মগনা।

২। সে কি এমনি মেয়ের মেয়ে
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করে কটাক্ষে হেরিয়ে
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পুরিয়ে।

৩। সে কি শুধু শিবের সতী ?
যারে কালের কাল করে প্রণতি
ষটচক্রে চক্র করি কমলে করে বসতি
সে যে সর্ব্বদলের দলপতি সহস্রদলে করে স্থিতি।

৪। হৃদ্‌কমল মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা
মন পবনে দুলাইছে দিবস রজনী ও মা।
ইড়া পিঙ্গলা নানা সুষুম্না মনোরমা
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা ব্রহ্মসনাতনী ও মা।

৫। আমার মনে বাসনা জননি
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে হ-ল-ক্ষ ব্রহ্মরূপিণী

এই গানটির গাঁথুনির মধ্যে সাধন ও তত্ত্বকথা এমন মিশ্রিত যে, সাধক ও সিদ্ধ ব্যতীত, কেবল সাহিত্যালোচনায় ইহার অর্থবোধ সম্পূর্ণ অসম্ভব।

৬। শমন আসার পথ ঘুচেছে
আমার মন সন্দ দূরে গেছে
আমার ঘরে ত নবদ্বারে চারি শিব চৌকি রয়েছে।

৭। তারা আছ গো অন্তরে মা আছ গো অন্তরে

কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী মা।

একস্থান মূলাধারে অন্য স্থান সহস্রারে

আর স্থান চিন্তামণিপুরে।

ইহার সহিত চণ্ডীদাসের

কিবা কারিকরের আজব কারিকুরি
তার মধ্যে ছয় পদ্ম রাখিয়াছে পুরি
সহস্রারে হয় পদ্ম সহস্রক দল
তার তলে মণিপুর পরমশিবের স্থল।

এই তত্ত্বগানটির ষটচক্র সাধনার নিতান্তই অনুরূপ বলিয়া মনে হয়। শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের কথাই আমরা এ যুগে শুনিয়া আসিতেছি * * কিন্তু মণিকোঠার খবর লইলে দেখা যাইবে বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপে, শাক্ত ও বৈষ্ণব দুই নহে—এক।* *

রামপ্রসাদের মানসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তর

প্রসাদী সঙ্গীতে বৈষ্ণব প্রভাব

তৃতীয় পল্লব

[রামপ্রসাদ বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কিনা—তাঁহার বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থে বৈষ্ণবের উপর শ্লেষ আছে। ইহা বৈষ্ণবের নিন্দা নয়, অবৈষ্ণবের নিন্দা। ইহা বিদ্বেষ নয়, ইহা বিদ্রূপ বা কৌতুক। কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন এই দুইখানি গীতিকাব্যই রামপ্রসাদ বৈষ্ণব-প্রভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া রচনা করিয়াছেন। শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিরোধের মধ্যে রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তন একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিয়াছে। কালীকীর্ত্তনের ভাষার সাক্ষী বৈষ্ণব-প্রভাবের অকাট্য প্রমাণ। বিদ্যাসুন্দরের ভাষার সাক্ষীও বৈষ্ণব-প্রভাবের আর এক প্রমাণ। আগমনী ও বিজয়ার বাৎসল্য-রসের সৃষ্টিতেও বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণকীর্ত্তনে বৈষ্ণব-প্রভাব শুধু নয়, বৈষ্ণব-সাধনে প্রবেশের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক সাধনাতেই সিদ্ধ অবস্থা, বিদ্বেষের অতীত অবস্থা। রামপ্রসাদ সিদ্ধ পুরুষ, সিদ্ধ পুরুষের বিদ্বেষ থাকে না। রামমোহনে বৈষ্ণব বিদ্বেষ আছে। রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীত একদিকে চণ্ডীদাসের ধারা, অপরদিকে রামপ্রসাদের ধারা, এই দুই ধারা হইতেই পৃথক—এমন কি উল্টা ধারা। রামমোহনের ব্রহ্ম-সঙ্গীত বাঙ্গালার প্রাচীন সাধনার ধারা হইতে জন্মে নাই। বাঙ্গালার প্রাণের সহিত ইহার যোগ নাই। বাঙ্গালা ইহা গ্রহণ করে নাই। রামপ্রসাদের গান, সমগ্র জীবনের গান, জীবনের কোন অংশের গান নহে। রামপ্রসাদ মূর্ত্তি-বিদ্বেষী নহেন। তীর্থ মাহাত্ম্যের অস্বীকারকারীও নহেন। লৌকিক সংস্কারের প্রতি কটাক্ষও ইহা নহে। ইহা সাধনের বিভিন্ন স্তরের একটা উচ্চস্তর মাত্র।

আমি আবার বলি যাহারা দেশের দশকর্ম্মের (১) এক কর্ম্মও না করিয়া নব্য-ন্যায় দায়ভাগ ও রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব এবং শাক্ত আর বৈষ্ণব এইসব চারিসিকি মিলাইয়া ষোল আনা বাঙ্গালার প্রাণের হিসাব করেন (২) আমার দুঃসাহস

১। "যাহারা দেশের দশকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, দেশের অন্তরঙ্গ সাধনা হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, যাহাদের প্রতি কথায়, প্রতি ভাবে, প্রতি কার্য্যে পশ্চিমী সেপাইয়ের খাড়া নজীর দেখাইতে হয়, যাহারা সংসারে জন্ম লইয়া নিজেদের প্রাণকে প্রতিনিয়তই নিজেরা ছলনা করে তাহাদিগকে বলিবার আমার কিছুই নাই।

[বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭]

বগুড়া অভিভাষণে—একবার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই ভাবে ও ভাষায় বলিয়াছিলেন। কাজেই এখন তিনি বলিতেছেন—"আমি আবার বলি।"—সম্পাদক।

২। (ক) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালার প্রাণকে "চারিসিকি মিলাইয়া ষোল আনা" রূপে দেখেন নাই। বাঙ্গালী সভ্যতার প্রত্যেক বিভাগ বা বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই তিনি বাঙ্গালার সমগ্র প্রাণকে দেখিয়াছেন। পরন্তু ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল Indian Messengerএর সমালোচনায়—সমগ্রের মধ্যে অংশকে দেখিয়াছেন। অংশের মধ্যে সমগ্রকে দেখা, আবার সমগ্রের মধ্যে অংশকে দেখা, এই দুই রকম দেখাই দার্শনিকগণ দেখিয়া থাকেন। চিত্তরঞ্জনের দেখার যাহা বৈশিষ্ট্য এখানে তাহাই বলা হইল মাত্র।

বাঁকীপুর অভিভাষণের ২।৩ দিন মাত্র পরে (১৯১৬ ডিসেম্বর) ডোমসারে (ফরিদপুর) "বিক্রমপুরের কথা" প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন —"সমস্ত বাঙ্গালা দেশে একটা চিরন্তন বাণী আছে। বাঙ্গালা দেশের ও সমগ্র বাঙ্গালী জাতির যে অখণ্ড ইতিহাস তাহা সেই বাণীকেই চিরকাল ঘোষণা করিয়াছে, এখনও করিতেছে ও চিরকাল করিবে"। আবার এই অখণ্ড বাঙ্গালী জাতির অখণ্ড ইতিহাসের মধ্যে বিক্রমপুরের

হইতে পারে—কিন্তু আমি তবু বলিব—যে তাঁহারা দেশের অন্তরঙ্গ সাধনা হইতে নিজদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া এই যে দাঁড়ে বাঁধা তোতাপাখীর বুলি আওড়াইতেছেন—ইহার মূল্য এক কাণাকড়িও নয়।

"একটা বিশিষ্ট ভাব, একটা স্বতন্ত্র প্রাণ আছে।" এবং এই বিক্রমপুরের বিশিষ্ট প্রাণকেও তিনি "অখণ্ড জীবন খণ্ড" বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "এই যে অখণ্ড জীবন খণ্ড (বিক্রমপুরের প্রাণ) তাহার বাণী শুনিতে চাই"। এই চারিসিকিতে ষোল আনার দৃষ্টি চিত্তরঞ্জনের স্বভাবগত নয়—ইহাই বলা উদ্দেশ্য। সম্পাদক

(1) "The charge against Rammohan is that he was not in tune with the soul of Bengal. He misunderstood Bengal, its religion, its society. Whatever he did by way of reform gave a misdirection to the life and activities of the people. For he has ignored the Gaudiya type of Vaishnavism which, in the opinion of the critic, forms the pith and marrow of Bengal's life. The critic forgets that the soul of Bengal is a much larger thing than is found expressed in the Bengali Vaishnava life and literature. Let us see what are the constituent elements of Bengal's culture."

(2) "The life and thought of Bengal is in the first place broad-based on the Smritis. The Dayabhag is a Bengali development of the traditional Smritis in a particular field and direction. In the same way on the basis of these Smritis, Raghunandan has organised and systematised the *Achara*, custom, ceremonial usage and religious observances for Bengali Hindus."

বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে বসিয়া যাঁহারা নিঃসঙ্কোচে লিখিতে পারিয়াছেন যে, রামপ্রসাদ বৈষ্ণব-

(3) "But the Karmakanda required a philosophy to supplement it. Bengal found this philosophy in her system of Nyaya, and not in the Jaiminiya system of the Purva Mimansa. The system of Nyaya as developed in Bengal is theistic."

(4) "While the Bengal school of law gave greater freedom to the individual, it curbed all tendencies towards individualistic excesses which came later on in the wake of the Siva, Sakta and Vaishnava cults, by organising family and social life on the traditional Dharma (duties) of the Smritis and by upholding a high ideal of institutional and social purity"

(5) "This is the background against which we must view the sectarian cults of Bengal. Their contributions are valuable so far as they enriched the life of our people in particular directions."

(6) "The soul of Bengal means all this, and will not be rightly conceived if we take into account one of these elements to the exclusion of the rest."

The Indian Messenger, March 3, 1918.
Obscurantism Paraded II.

উপরে উদ্ধৃত সমালোচনার প্রতিবাদ স্বরূপ চিত্তরঞ্জন তাঁহার বগুড়া অভিভাষণের বক্তব্যকেই পুনরায় সমর্থন করিতেছেন। সম্পাদক।

শ্রদ্ধেয় ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থের ১১দশ অধ্যায়ের শেষ ভাগে বলিয়াছেন—"কপিলদেবপ্রিয়া, ন্যায়শাস্ত্র-প্রসূতি, তন্ত্রশাস্ত্রজননী বঙ্গমাতা কতকাল আত্মবিস্মৃতা হইয়া নীচানুকরণ-

বিদ্বেষী ছিলেন (১) তাঁহারা দেশের দুর্ভাগ্য—পাশ্চাত্ত্যোৎসাহে এতই বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের ঐতিহাসিক লেখকদিগকে এমনই অন্ধভাবে অনুকরণ করিয়াছেন যে, দশকর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও এরূপ অপকর্ম্ম তাঁহারা করিতে পারিয়াছেন।

রামপ্রসাদকে বৈষ্ণব-বিদ্বেষী বলিয়া যাঁহার লেখনী কলঙ্কিত —বাঙ্গালা সাহিত্যের যত বড় ইতিহাসই তিনি লিখুন না কেন, (২) আমি বলিব—তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারায় বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপ খুঁজিয়া পান নাই। ইহা আমার হয়ত দুঃসাহস। কিন্তু দুঃসাহসের আজ অন্ত নাই বলিয়াই এরূপ ঘটে।

রামপ্রসাদ বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কিসে ? বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থে তাঁহার বৈষ্ণবের উপর শ্লেষ আছে। 'বিদ্যাসুন্দর'—রামপ্রসাদের নিতান্তই প্রথম অবস্থার রচনা। আর এই গ্রন্থে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা প্রচলিত ধারাকে অনুকরণ করিয়াছিলেন মাত্র। শুনা যায় শাক্ত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে রাম-

রত থাকিবেন।" বাঙ্গালী সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এখানে সাংখ্য-দর্শনের উল্লেখ, এবং তৎসঙ্গে স্মৃতিশাস্ত্র ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুল্লেখ প্রণিধান যোগ্য।—সম্পাদক।

১। "রামপ্রসাদ বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন। বৈষ্ণব নিন্দায় একটু বিদ্রূপ শক্তি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা এইরূপ,—"খাসা চীরা বহির্বাস রাঙ্গা চীরা মাথে।"

[বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—ডাঃ দীনেশ সেন]

২। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনকে লক্ষ্য করিয়াই চিত্তরঞ্জন বলিতেছেন।

—সম্পাদক।

প্রসাদ তাঁহার এই প্রথম গ্রন্থরচনা উপহার দিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট বৈষ্ণবের উপর ব্যঙ্গোক্তিকে সত্যসত্যই রাম-প্রসাদের অন্তর্নিহিত বৈষ্ণব-বিদ্বেষ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যেমন কবির উপর, ততোধিক কাব্যের উপর অবিচার। কবির বর্ণনার কোন কৌতুকাবহ ব্যঙ্গোক্তিকে যাঁহারা বিদ্বেষ ব্যতিরেকে আর কিছু ভাবিতে পারেন না—তাঁহাদের কাব্যা-লোচনা সমালোচনার অতীত নহে।

সাধন-অনভিজ্ঞ সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন তরুণ যুবক কৃষ্ণচন্দ্রীয় শাক্তযুগের (১) গড্ডলিকা প্রবাহে ভাসিয়া—অপরিণত বয়সে যে কাব্য রচনা করিয়াছেন—সেই বিস্তৃত কাব্য হইতে কয়েকটি ছত্র উদ্ধার করিয়া যিনি রামপ্রসাদের বৈষ্ণব-বিদ্বেষ প্রমাণ করিতে চান—তাঁহাকে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারায় একজন পথভ্রান্ত পথিক ভিন্ন আর কি বলিতে পারি ?

১। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর রচয়িতা রামপ্রসাদকে কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের আবহাওয়াতে ফেলিয়াই দেখিতেছেন। কিন্তু প্রসাদী সঙ্গীতের রামপ্রসাদকে কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ অতিক্রম করিয়া দেখিয়াছেন। ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে।

এইরূপ দেখা অত্যন্ত সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কেননা এইরূপ দুইটি বিভিন্ন যুগে রামপ্রসাদকে দেখিবার আভ্যন্তরিক প্রমাণ প্রসাদী বিদ্যাসুন্দরেই আছে। যথা—

"গ্রন্থ (বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থ) যাবে গড়াগড়ি, গানে হব ব্যস্ত।"

—সম্পাদক।

ছত্র কয়টি এইরূপ—

খাসা চীরা বহির্বাস, রাঙ্গা চীরা মাথে।
চিকন গুধড়ী গায়, বাঁকা কোঁৎকা হাতে॥
মুঞ্জ গুঞ্জ ছড়া গলে ঠাই ঠাই ছাব।
দুই ভাই ভজে তারা সৃষ্টিছাড়া ভাব॥
পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে খান সাত আট।
ভেকা লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট॥
এক এক জনার ধুমড়ী দুটী দুটী।
দুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবার কুটা॥
ডুগলামি ভাবে ভাব জন্মে থেকে থেকে।
বীরভদ্র অদ্বৈত বিষম উঠে ডেকে॥
সে রসে রসিক নবশাক লোক যত।
উঠে ছুটে পায় পড়ে করে দণ্ডবৎ॥

* * *

বৈষ্ণব বন্দনা গ্রন্থ সকলে পড়ায়।
ছত্রিশ আশ্রম নিয়া একত্র জড়ায়॥
কেমনে করিল কর্ম্ম কব আর কি।
মজাইল গৃহস্থের কত বহু ঝী॥

(চরসমূহের ছদ্মবেশে চোর অন্বেষণ—প্রসাদী বিদ্যাসুন্দর)

ইহা একখানি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালী বৈষ্ণবের দুর্গতির আলেখ্য। ভেকা লোককে ভুলান, এক এক জনার দুটী দুটী ধূমড়ী, গঞ্জিকা প্রসাদে লাল চক্ষু—ইহা ত

বৈষ্ণবকে নিন্দা নয়। বৈষ্ণব নামধারী অবৈষ্ণবের নিন্দা। তারপর খাসা চীরা বহির্বাস—ইহা ত সহাস্য কৌতুক—ইহাতে বিদ্বেষ কোথায়? (২)

বিদ্যাসুন্দরের পর রামপ্রসাদ কালী কীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন রচনা করেন। এই দুইখানিই গীতিকাব্য। এই দুইখানি গীতিকাব্যই রামপ্রসাদ বৈষ্ণব-প্রভাব দ্বারা (বিদ্বেষ নয়) অনুপ্রাণিত হইয়া বচনা করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবের বৃন্দাবন লীলার—যশোদা ও গোপালের বাৎসল্য-ভাবে ভরপুর না হইলে, রামপ্রসাদের পক্ষে—মেনকার ও গৌরীর বাৎসল্যরস কাব্যের রূপে রূপান্তর করা অসম্ভব ছিল।

ইহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, প্রচলিত শাক্ত ও বৈষ্ণবের সাধারণ ধর্ম্ম-কলহের মধ্যে রামপ্রসাদ তাঁহার কালী-কীর্ত্তনে একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক আজু গোসাঞীদের পল্লবগ্রাহিতায় আমি আশ্চর্য্য না হইয়া পারিতেছি না। কালী-কীর্ত্তনে ভাষার সাক্ষীই বৈষ্ণব প্রভাবের অকাট্য প্রমাণ।

২। রামপ্রসাদের এই গানটির প্রভাব রামমোহনে আছে বলিয়া মনে হয়। (ক) "দুই ভাই ভজে" (খ) "নবশাক লোক যত" (গ) "ছত্রিশ আশ্রম নিয়া একত্র জড়ায়"। রামমোহন এ সকল গ্রহণ করিয়া প্রায় এই ভাষাতেই বৈষ্ণবের নিন্দা করিয়াছেন। রামমোহন লিখিয়াছেন—
(ক) "বেদবিধির অগোচর গৌরাঙ্গ ও দুটি ভাই—ও তিন প্রভু" (খ) "বস্তুতঃ তাঁতি, শুড়ি, সুবর্ণবণিক ও কৈবর্ত্ত * ঐ সকল তন্ত্রকে ও তদুক্ত অনুষ্ঠানকে যদিও দ্বেষ করিয়া থাকেন।" (গ) "বৈষ্ণবেরা বর্ণ বিচার না করিয়া পঙ্গতে ভোজন ও অধরামৃত গ্রহণ করেন।" সম্পাদক।

দর দর দর ঝরত লোর, চর চর চর তনু বিভোর
কবহুঁ কবহুঁ করত কোর, থোর থোর দোলনা

* * *

ঝুনুর ঝুনুর ঘুঙ্গুর নাদ, কিঙ্কিনী রব উভয় বাদ…
ইত্যাদি।

এমন কি বিদ্যাসুন্দরের ভাষার সাক্ষীও বৈষ্ণব-প্রভাবের প্রমাণ দিতে পারে।

কাতর কামিনী বদন যামিনী নাথ মলিন হি ভেল
মুকুতা জৈসন সোহত ঐসন সরমজল উপজেল।

ইহা শুধু ভাষায় নয়—ভাবেও বৈষ্ণব। যাহাকে বিদ্বেষ করা যায়—তাহা কি কবির ও কাব্যের উপর এইরূপ প্রভাব বিস্তার করে?

আগমনী ও বিজয়ার বাৎসল্য রসের যে সৃষ্টি—তাহার কথা আমি আপনাদিগকে আর একবার বিস্তৃত ভাবে বলিয়াছি। (১) বাঙ্গালী গৃহস্থের বালিকা কন্যার শ্বশুরালয় হইতে আগমনের

১। (ক) "বাঙ্গালী জাতির খাঁটী কবি রামপ্রসাদ, আর বাঙ্গালী জাতির অখাঁটী কবি বা মুসলমানী সভ্যতার ধারার কবি ভারতচন্দ্র। ভারতচন্দ্রের ক্ষমতা অসাধারণ হইলেও, তাঁহার কাব্য সুন্দর হইলেও, তাহার মধ্যে বিজাতীয় ভাব, হাবভাব, ধারা-ধরণ ছিল ও আছে। রামপ্রসাদের ভিতর হিন্দুর পৌরাণিক সত্য-সংস্কারজনিত প্রাণের পরিচয় আছে। একদিকে মুসলমান বাঙ্গালী কবি আলোয়ালের পদ্মাবতী ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের মাঝে, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ও কালীকীর্ত্তন সেই যুগের দুই ধারাকে স্রোতের মত লইয়া গেছে; কিন্তু দুই স্রোত

গানই 'আগমনী', আর শ্বশুরালয়ে গমনের গানই 'বিজয়া'। বাঙ্গালীর ঘরের কথা, গৃহস্থালীর কথাই কবির কাব্যলোকে

গঙ্গা-যমুনার মত মিলিতে পারে নাই, পারিবেও না। বৈশিষ্ট্য থাকিয়া যায়, বৈশিষ্ট্যই ভগবানের অভিপ্রেত। বিশেষেই রূপ সৃষ্ট হয়।"

রামপ্রসাদ কালী কীর্ত্তনের প্রথমেই গাহিলেন,—

"গিরিবর! আর পারিনে হে'
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন পান
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥"

(খ) "এই বাৎসল্য রসের চিত্র ও গানটিকে এই ফেরঙ্গ যুগে ঘোরো কবিতা বলিয়া ব্যঙ্গ করা সহজ, কিন্তু যাঁহারা সত্য মাতৃত্ব, পিতৃত্ব ও বাৎসল্য-রস জীবনে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া প্রাণের ভিতর অনুভূতিতে সে রস আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ইহার তুলনা কেহ দিতে পারে না। প্রথম ইহা সত্যই বাঙ্গালার নিতান্ত ঘরের ছবি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহা ঘর ছাড়িয়া আসল ঘরেরও ছবি। আমরা প্রথম হইতেই এই গানটিকে সকল দিক দিয়া দেখিতে চাই।" * * * *

(গ) "তখন দ্রষ্টা শ্রীরামপ্রসাদ বলিতেছেন,—
"জগজ্জননী যার ঘরে।"

মেয়ের মুখ দেখিয়া সেই বিশ্বমাতার রূপের কল্পনা ও ধ্যান মনে পড়িল। শুধু মনে পড়িল নয়, জাতির জীবনের ধারায় যে পৌরাণিকী কল্পনা আজও পর্য্যন্ত তাহার মেরুদণ্ড হইয়া আছে, তাহার ভিতর দিয়া সেই জগন্মাতার ভাবটীকেও মিলাইয়াছেন। তাহার পর মেয়ে ঘুমাইয়া পড়িল। এই যে বাৎসল্য রসের ছবি, ইহা বাঙ্গালার ঘোরো রস হইলেও ইহার 'বিশ্ব' মোহ নাই। বাঙ্গালার জাত মারা যায় নাই। বাঙ্গালার সকল রং গঠন হাবভাব সকলই আছে, অথচ কাব্যের গানের যে প্রাণ, যেরূপ রূপান্তর, তাহাও হইয়াছে। যখন পেটের মেয়ের মুখে বিশ্বমায়ের রূপ এমন করিয়া ফুটিয়া উঠে, তখনই রূপান্তর হয়"

[বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭]

কল্পকলায় রূপান্তরিত হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। ইহা ঘরকন্নার স্নেহরসের ব্যাপার হইলেও—এই রচনাটিতেও রামপ্রসাদের উপর বৈষ্ণব-প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে বৈষ্ণব-প্রভাব ও বৈষ্ণবীয় সাধনায় বিশেষ প্রবেশেরই পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্বেষ ত দূরের কথা, সাধনাঙ্গে প্রবেশ না থাকিলে—বৈষ্ণবীয় ভাব লইয়া রামপ্রসাদ কখনই কল্পকলার রূপান্তরে এতদূর সফলকাম হইতে পারিতেন না।

প্রথম বয়স রাই রসরঙ্গিনী,
ঝলমল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী।
রাই বদন চেয়ে ললিতা বলে,
রাই আমার মোহন মোহিনী॥
রাই যে পথে প্রয়াণ করে,
মদন পলায় ডরে॥
কুটিল কটাক্ষ শরে।
জিনিল কুসুম শরে॥
কিবা চাঁচর সুন্দর কেশ
সখী বকুলে বানাইল বেশ
তার গন্ধে অলিকুল হইয়া আকুল,
কেশে করিছে প্রবেশ॥
*　　*　　*
চারু অপাঙ্গ কাম-কানন।
নাসা তিলক খর শরাসন॥

সেই শ্যামসুন্দর মানস মৃগবর।
ভাবে বুঝি করিয়াছে সন্ধান ॥

তারপর এইবার আমি রামপ্রসাদের যাহা বৈশিষ্ট্য, সাধনাঙ্গের অতি উচ্চ অবস্থার কয়েকটি গানের সাক্ষ্য আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

১। মা আমার অন্তরে আছ, তোমায় কে বলে
অন্তরে শ্যামা।
উপাসনা ভেদে তুমি প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ
যেজন পাঁচেরে একাকার ভাবে তার হাতে
মা কোথা বাঁচ ॥

জার্ম্মান পণ্ডিতদের নকল করিয়া বাঙ্গালার তোতাপাখিগণ বোধ হয় ইহাকে হিনোথিজমের ক্যাটেগরিতে ফেলিবেন। আমি কল্পকলার অভিব্যক্তিতে ক্যাটেগরি বড় ভয় করি। আমি হিনোথিজম বুঝি না। বুঝিতে চাই না। আমি দেখিতেছি জীবন ও তাহার সাধনা। সাধনার অনুরূপ কল্পকলার রূপান্তর। ভেদ শুধু উপাসনা পদ্ধতিতে। বিভিন্ন স্বভাবের, বিভিন্ন স্তরের অধিকারী—পাঁচ রকমের বিভিন্ন উপাসনাই গ্রহণ করিবেন। কিন্তু উপাস্য পাঁচ নয়—এক। জীবনে, সাধনে, রূপে ও সুরে রামপ্রসাদ এই কথাই বলিলেন। চণ্ডীদাসও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। (১) বাঙ্গালার সাধনার বৈচিত্র্য আছে

১। ক। এই রূপান্তর চণ্ডীদাসের জীবনে হইয়াছিল। * * এই রূপান্তর রামপ্রসাদের হইয়াছিল।” (বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭)

ও থাকিবে। কিন্তু বৈচিত্র্য অর্থ বিদ্বেষ নয়। বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপটি জাগিলেই—এই ভ্রমে আর পড়িতে হয় না।

পূর্ব্বোক্ত গানটিতে এই প্রমাণ হইল যে রামপ্রসাদের শক্তিসাধনায় পাঁচেরে এক করিয়া ভাবিবার অধিকার আছে। বৈচিত্র্যে বিকশিত যিনি—তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্। এই একমেবাদ্বিতীয়মের সাধনা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের বাঙ্গালীও করিয়া গিয়াছে। শুধু তাই নয়, এই সাধনে সিদ্ধকাম হইয়া গিয়াছে। তারপর—

২। কালী হলি মা রাসবিহারী।

৩। মন করোনা দ্বেষাদ্বেষি।

৪। যেই শ্যাম সেই শ্যামা।

৫। কালীঘাটে কালী তুমি,

মাগো কৈলাশে ভবানী

বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী,

গোকুলে গোপিনী গো মা।

খ। চণ্ডীদাসের জীবনে রূপান্তর হইয়াছিল—তাঁহার সৃষ্টিই তাহার প্রমাণ। রামপ্রসাদের জীবনে রূপান্তর হইয়াছিল, তাঁহার সৃষ্টিও তাহারই প্রমাণ।"

[রূপান্তরের কথা—১৯১৭]

বর্ত্তমান প্রবন্ধগুলিতে রামপ্রসাদ সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন যাহা বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন, সূত্রাকারে পূর্ব্বে অনেকবার তাহা তিনি বলিয়াছেন।

—সম্পাদক।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের একজন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাধকের গানেও আমরা ধর্ম্মবিদ্বেষ আঘ্রাণ না করিয়া পারিতেছি না। যে যে সাধনই অবলম্বন করুন—সিদ্ধ অবস্থা যে বৈষ্ণব বিদ্বেষের অতীত অবস্থা—তাহা রামমোহন যুগের বাঙ্গালীর পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা একটু কঠিন বই কি? রামপ্রসাদ সিদ্ধ পুরুষ। সিদ্ধ পুরুষে কোন দ্বেষই থাকিতে পারে না। যদি বল কেন, রামমোহনে ত বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ছিল (১) তার এক

১। **রামমোহনের রচনায় বৈষ্ণব বিদ্বেষ—**

(ক) "এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবেরা যেমন শ্রীভাগবতকে ভাষ্য করিয়া প্রমাণ করিবার নিমিত্ত গরুড় পুরাণ বলিয়া বচন রচনা করিয়াছেন;— আর—

দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে জন্ম যাঁহাদের, এবং অন্য দেশে অপ্রসিদ্ধ, এমত নবীন নবীন ব্যক্তিকে অবতার করিয়া স্থাপন করিবার নিমিত্ত ভবিষ্য ও পদ্ম পুরাণ বলিয়া যেমন কল্পিত বচন লিখেন"

[গোস্বামীর সহিত বিচার)

(খ) "এ ধর্ম্মসংহারকের ব্যবহার পণ্ডিতেরা দেখুন, গৌরাঙ্গকে প্রাচীন ও নবীন গ্রন্থকারেরা কেহ কোন স্থানে বিষ্ণুর অবতার কহেন নাই, বরঞ্চ ঐ গৌরাঙ্গমতস্থাপক তৎকালীন গোঁসাইরা, যাঁহাদের তুল্য পণ্ডিত ও মতে জন্মে নাই, তাঁহারা যদ্যপি গৌরাঙ্গকে বিষ্ণুরূপে মানিতেন, কিন্তু কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এ অনন্ত সংহিতার বচন সকল লিখেন নাই, যাহাতে গৌরাঙ্গ বিষ্ণু অবতার হয়েন ইহা স্পষ্ট প্রাপ্ত হয়, এখন বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন, যে এমত ব্যক্তি হইতে কি কি বিরুদ্ধ কর্ম্ম না হইতে পারে, যিনি গৌরাঙ্গকে অবতার স্থাপনের নিমিত্ত এ সকল বচনকে ঋষি প্রণীত করিয়া লোকে প্রসিদ্ধ করেন; কিন্তু পণ্ডিতেরা এ সকল কল্পনাতে কদাপি ক্ষুব্ধ হইবেন না, যেহেতু যে সকল পুরাণ ও সংহিতাদি শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ টীকা না থাকে, তাহার বচনের প্রামাণ্য প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারের ধৃত হইলেই হয়, এই সর্ব্বত্র নিয়ম আছে, তাহার

কারণ এই যে এরূপ ধর্ম্মসংহারক সর্ব্বকালেই আছেন, কখন গৌরাঙ্গকে অবতার করিবার উদ্দেশ্যে অনন্ত সংহিতার নাম লইয়া দুই কি দুই শত অনুষ্টুপ ছন্দের শ্লোক লিখিতে অক্লেশে পারেন, কখন বা নিত্যানন্দের অবতার স্থাপনের জন্যে নাগ সংহিতা কহিয়া দুই চারি বচন লিখিবার কি অসাধ্য তাঁহাদের ছিল। কখন বা ফণিসংহিতা নাম দিয়া অদ্বৈতের প্রমাণের নিমিত্ত চারি পাঁচ শ্লোক প্রমাণ দিতে পারিতেন, বরঞ্চ কর্কট সংহিতার নাম লইয়া এই ধর্ম্ম সংহারক ধর্ম্মসংস্থাপক রূপে অবতীর্ণ হওয়ার প্রমাণ দিতে সেই সকল লোকের আশ্চর্য্য কি, অতএব ঐ সকল লোক হইতে এইরূপ ধর্ম্মচ্ছেদের নিবারণের নিমিত্ত পণ্ডিতেরা পুরাণ সংহিতাদির প্রামাণ্যের বিষয়ে এই নিয়ম করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রসিদ্ধ টীকা সম্মত, অথবা প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ধৃত ব্যতিরেক সামান্যত বচনের গ্রাহ্যতা নাই, যদ্যপিও এই নিয়মের অন্যথা করিয়া প্রসিদ্ধ টীকা রহিত ও অন্য গ্রন্থকারের ধৃত বিনা পুরাণ সংহিতা তন্ত্রাদি শাস্ত্রের নামোল্লেখ মাত্র বচনের প্রামাণ্য জন্মে তবে তন্ত্র রত্নাকরের প্রমাণ, গৌরাঙ্গ ও তৎ সম্প্রদায়ের উচ্ছেদে কারণ কেননা হয়েন ?" [পথ্য-প্রদান]

(গ) "আর শুভসূচক কর্ম্মের মধ্যে জগদ্ধাত্রী রটন্তী ইত্যাদি পূজা, আর মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ এ কোন পরম্পরায় হইয়া আসিতেছিল ?" [ঈশোপনিষদ ভূমিকা]

(ঘ) "ধর্ম্ম সংহারকের এই লক্ষণ দ্বারা সম্প্রতি জানা গেল যে, চরিতামৃতই নিগূঢ় শাস্ত্র হয়েন, যেহেতু পণ্ডিত লোক সমাগমে চরিতামৃত ডোর পড়িয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে বহুবিজ্ঞ জনের বিদিত না হয়, ও [পঙ্গতে অভক্ষ্য ভক্ষণাদি ও উপাসনায় অগম্যাগমন বর্ণন ঐ চরিতামৃতে বিশেষরূপে আছে] অতএব ঐ লক্ষণ দ্বারা চরিতামৃত সুতরাং নিগূঢ় শাস্ত্র হইলেন।

গৌরাঙ্গ যাহার পরব্রহ্ম ও চৈতন্য চরিতামৃত যাহার শব্দব্রহ্ম তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ যদ্যপি কেবল বৃথা শ্রমের কারণ হয়, তথাপি কেবল অনুকম্পাধীন এ পর্য্যন্ত চেষ্টা করা যাইতেছে।" [পথ্য-প্রদান]

(ঙ) "যাহারা বেদ ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে অপ্রাপ্ত কেবল—চৈতন্য-চরিতামৃতীয় উপাসনা করেন ও—স্ব স্ব জাতীয় আচার ত্যাগ করিয়া

অন্ত্যজাদির সহিত পঙ্গতে তত্তৎ স্পৃষ্ট অখাদ্য ও অপেয় আহার করেন, তাঁহারা যথার্থরূপে ঐ লক্ষণাক্রান্ত হয়েন কি না ইহা ধর্ম্ম সংহারকই বিবেচনা করিবেন।" [পথ্য-প্রদান]

(চ) "আর যে ব্যক্তির পরমেশ্বর বিষয়ে শ্রদ্ধা না হইয়া স্ত্রীসুখাদি বিষয়ে সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা হয় তাহার প্রতি স্ত্রীপুরুষের ক্রীড়াঘটিত উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। এবং সে কহে যে বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনু শৃনুয়াদম বর্ণয়েদমঃ ইত্যাদি। যে ব্যক্তি ব্রজবধূদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই ক্রীড়াকে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ করে, এবং বর্ণন করে, সে ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণেতে পরম ভক্তি হইয়া, অন্তঃকরণের দুঃখ ত্বরায় নিবৃত্তি হয়।" (মাণ্ডুক্যোপনিষৎ)

(ছ) "বেদান্তের কোন শ্রুতির এবং কোন সূত্রের অর্থ এই সকল (বস্ত্রহরণ-রাসলীলা প্রভৃতি) সর্ব্বলোক বিরুদ্ধ আচরণ হয়, ইহা বিজ্ঞলোক পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া কেন না বিবেচনা করেন ?"

(গোস্বামীর সহিত বিচার)

(জ) পক্ষপাত ও অভ্যাস এ দুইকে ধন্য করিয়া মানি যে অনেককে অনায়াসে বিশ্বাস করাইয়াছে যে—আনন্দের রচিত হস্তপদাদি বিশিষ্ট মূর্ত্তি আছেন—তাঁহার বেশ ভূষা, বস্ত্র, আভরণ ইত্যাদি সকল আনন্দের হয়।

—এবং ধাম ও পার্শ্ববর্ত্তী ও প্রেয়সী এবং বৃক্ষাদি সকল আনন্দের রচিত বস্তু, আনন্দের দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ড হয়। অথচ আনন্দ কিম্বা ক্রোধাদির ব্রহ্মাণ্ড দেখা দূরে থাকুক, অদ্যাপি কেহ আনন্দাদি রচিত কণিকাও দেখিতে পাইলেন না।" (গোস্বামীর সহিত বিচার)

(ঝ) "পূর্ব্বে যে সকল অধিকারী দুর্ব্বল ছিলেন, তাঁহারা মন স্থিরের নিমিত্ত যে কাল্পনিক রূপের উপাসনা করিতেন, সেই রূপকে পরব্রহ্ম প্রাপ্তির কেবল উপায় জানিতেন, কিন্তু সেই পরিমিত কাল্পনিক রূপকে বিভু ও নিত্য এবং নিত্যধামবাসী, যাহা বেদ এবং যুক্তি এ উভয়ের বিরুদ্ধ হয়, এমত জানিতেন না। পরন্তু সেই কাল্পনিক রূপকে বিভু, নিত্য ও নিত্যধামবাসী করিয়া জানা, ইহা অল্পকালের পরম্পরা দ্বারা এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।" (গোস্বামীর সহিত বিচার)

(ঞ) "যুক্তি হইতে এককালে চক্ষু মুদিত করিয়া দুর্জ্জয় মানভঙ্গ যাত্রা ও সুবল সংবাদ এবং বড়াই বুড়ীর উপাখ্যান—যাহা কেবল চিত্ত মালিন্যের ও মন্দ সংস্কারের কারণ হয়, তাহাকে পরমার্থ সাধন করিয়া জানে ও আপন ইষ্ট দেবতার সঙ্গকে সম্মুখে নৃত্য করায়, কেবল অন্যকে এ সকল ক্রিয়া করিতে দেখিয়া, সেই প্রমাণে অনুষ্ঠান করে, এমত ব্যক্তির প্রতি গড্ডলিকা বলিয়া শব্দের প্রয়োগ উচিত হয়।" (চারি প্রশ্নের উত্তর)

(ট) "গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ এবং কবিরাজ গোঁসাই ও রূপদাস, জীবদাস প্রভৃতিকে গৌরাঙ্গীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা মহাজন কহিয়া, তাঁহাদিগের গ্রন্থানুসারে পরম্পরায় আচার করিতে উদ্যুক্ত হয়েন।"

* * * কিন্তু একের মহাজনকে অন্যে মহাজন কি কহিবে, বরঞ্চ খাতকও কহে না; এবং ঐ সকল মহাজনের অনুগামীরা পরস্পরকে নিন্দিত ও অশুচি কহিয়া থাকেন।" (চারি প্রশ্নের উত্তর)

(ঠ) "যাঁহারা পরমেশ্বরের জন্ম, মরণ, চৌর্য্য, পরদারাভিমর্ষণ ইত্যাদি দোষকে যথার্থ জানিয়া অপবাদ দিতে পারেন, তাঁহারা যে কেবল অনিবেদিত ভোজনের অপবাদ মনুষ্যকে দিয়া ক্ষান্ত থাকেন, ইহাও আহ্লাদের বিষয়।" (চারি প্রশ্নের উত্তর)

বগুড়া অভিভাষণের অব্যবহিত পূর্ব্বে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দৃষ্টি উপরে উদ্ধৃত অংশগুলির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। এবং রামমোহনের এই সকল উক্তি হইতে তিনি রামমোহনকে বৈষ্ণববিদ্বেষী, এবং বাঙ্গালার প্রাণের সহিত রামমোহনের যোগ নাই,—এইরূপ সিদ্ধান্তে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু তাই বলিয়া রামমোহনের প্রতিভাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে সম্মান করিতে তিনি এতটুকুও কার্পণ্য করেন নাই। দৃষ্টান্ত অনেক আছে। যথা :—

—"রামপ্রসাদের সাধন সঙ্গীতে আমরা মজিলাম। বুঝিলাম, কেন ইংরাজ এদেশে আসিল। বুঝিলাম, **রামমোহনের তপস্যার** নিগূঢ় মর্ম্ম কি ?" (বাঙ্গালার কথা ভবানীপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অভিভাষণ। ১৯১৭)—সম্পাদক।

উত্তর এই যে, পণ্ডিত ও মেধাবী রামমোহন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন না। বাক্‌বিতণ্ডা, শাস্ত্র মীমাংসায় তিনি জগজ্জয়ীও যদি হইয়া থাকেন তথাপি তিনি সিদ্ধিরূপ মণিকোঠার নিম্নতম সোপানেও পৌঁছিতে পারেন নাই। রামপ্রসাদ ও রামমোহনকে জোর করিয়া একই ধারায় দাঁড় করাইবার চেষ্টার মত হাস্যকর চেষ্টা আর কিছুই হইতে পারে না। (২) রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীতে

(২) "রাজা রামমোহন রায় গভীর শাস্ত্রানুসন্ধানপূর্ব্বক যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, রামপ্রসাদ নির্ম্মল ভক্তিবিহ্বলতায় তৎপুর্ব্বেই সেগুলি হৃদয়ে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি প্রেম-স্নিগ্ধ হৃদয়ের অনুভূতির বলে পুস্তকগত বিদ্যার অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া নির্ম্মল সত্যরাজ্য ছুঁইতে পারিয়াছিলেন।

'কি কাজ রে মন যেয়ে কাশী।'
"নানা তীর্থ পর্য্যটনে শ্রম মাত্র পথ হেঁটে।"

প্রভৃতি বাক্যে তিনি তীর্থযাত্রার সম্বন্ধে লৌকিক আস্থার প্রতি নির্ভীক ভাবে কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন।

'ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তা জান না।
মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়ে মন তার করতে চাওরে উপাসনা॥
ধাতু পাষাণ মাটি মূর্ত্তি কাজ কি রে তোর সে গঠনে।

প্রভৃতি কথা তিনি রাজা রামমোহনের পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত গানের সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের—

"আবাহন বিসর্জ্জন কর তুমি কার।"

প্রভৃতি গান একস্থলে রক্ষিত হইবার যোগ্য।

'বেদে দিল চক্ষে ধূলা,
ষড়দর্শনের সেই অন্ধগুলা'—

বাক্যে রামপ্রসাদ ভক্তির বলে বলীয়ান হইয়া শাস্ত্রের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে সাহসী হইয়াছিলেন।"

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—ডাঃ দীনেশ সেন)

যদি কোন ধারা আসিয়া থাকে তবে তাহা যেমন চণ্ডীদাসের ধারা হইতে তেমনি রামপ্রসাদের ধারা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক—এমন কি উল্টা ধারা (৩), আমার এই কথা লইয়াই কথা উঠিয়াছে। যখন কথা উঠিয়াছে তখন কথায় যতদূর সম্ভব আমি আবার পরিষ্কার করিয়া আপনাদের নিকট বলিবার চেষ্টা করিব।

৩। (ক) **"রামপ্রসাদ যে সুরে গাহিয়া গেলেন, রামমোহন ঠিক তার উল্টা সুর ধরিলেন।"**

(বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭)

বগুড়া অভিভাষণের এই মন্তব্যটির উপরেই বিরুদ্ধ সমালোচনার ঝটিকা প্রবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ঝটিকা সত্ত্বেও হাল ছাড়েন নাই। কেননা তিনি পুনবায় বলিতেছেন, প্রসাদী সঙ্গীত হইতে রামমোহনের ব্রহ্ম সঙ্গীত সম্পূর্ণ পৃথক। এমন কি উল্টা ধারা।"

সম্পাদক।

(খ) "রামমোহনের গ্রন্থাদি হইতে বৈষ্ণবের প্রতি অযথা বিদ্বেষ ও সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিক সাধনার প্রতি অযথা আসক্তি,—এ সকলের প্রমাণ প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়। এমন কি দুই সাধন পদ্ধতির সমালোচনায় তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বীদিগের জাত তুলিয়া গালি দিতে ছাড়েন নাই।"

(বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭)

(গ) রামমোহনের বৈষ্ণব-বিদ্বেষের কথা তাঁহার রচিত পুস্তকাদির মধ্যে অনেক পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

"* * * যে বালিশে পৃষ্ঠ প্রদান ও তাম্রকূট পান পূর্ব্বক আপন আপন ইষ্ট দেবতার সঙ্গকে সম্মুখে নৃত্য করাইয়া আমোদ করা কোন সদযুক্তি ও সৎপ্রমাণ হয়? এবং দুর্জ্জয় মানভঙ্গ যাত্রায় নাপিতানীর বেশ ইষ্টদেবতার করা কোন্ সদযুক্তি ও সৎপ্রমাণ হয়? ও বেসো, কেসো, বড়াই বুড়ী ইত্যাদি দ্বারা ইষ্ট দেবতার উপহাস করা কোন সদযুক্তি ও সৎ প্রমাণ হয়?" (বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭)

২

আমি বলিয়াছিলাম এবং দীর্ঘ এক বৎসর (১) আবার ভাবিয়া দেখিয়া বলিতেছি যে রামমোহনের সঙ্গীত ধারা বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপ হইতে জন্মে নাই, রামমোহন তাঁহার ব্রহ্ম সঙ্গীতে বাঙ্গালার প্রাণের ধারার বিনাশকারী বিজাতীয় এক অস্বাভাবিক ধারাকে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং রামমোহনের ধারা বাঙ্গালা গ্রহণ করে নাই। (২)

১। "দীর্ঘ এক বৎসর—"? বগুড়া অভিভাষণ ১৩২৪ অগ্রহায়ণ সংখ্যার "নারায়ণে" প্রকাশিত হয়। ১৯১৭। ১৫ই নভেম্বর হইতে ১৫ই ডিসেম্বর প্রকাশের তারিখ ধরিয়া লওয়া যায়। অভিভাষণটি "নারায়ণে" প্রকাশের ২।১ মাস পূর্ব্বে বগুড়ায় চিত্তরঞ্জন নিজে পাঠ করিয়াছিলেন। আমরা উপস্থিত ছিলাম।

১৯১৮। জানুয়ারী মাসে এই অভিভাষণের বিরুদ্ধে নানাদিক হইতে তীব্র সমালোচনা ও প্রতিবাদ হয়। ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়,—পরলোকগত প্রতুলচন্দ্র সোমকে দিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সাপ্তাহিক পত্রিকা Indian Messenger এ—১৯১৮।২০ শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৭ই এপ্রিল, এই ৭ সপ্তাহে ৭টী গবেষণামূলক প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। ১৯১৮।৭ই এপ্রিল হইতেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—বাঙ্গালা-গীতিকবিতার ধারায় প্রসাদী সঙ্গীত আলোচনা প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্র বাবুর প্রতিবাদের উত্তর দিবার কথা ভাবিতেছিলেন। ১৯১৯ খৃঃর শেষভাগে "রামপ্রসাদ" প্রবন্ধ রচনা একপ্রকার শেষ হয়। ১৯১৮ খৃঃর শেষার্দ্ধ ও ১৯১৯ খৃঃর প্রথমার্দ্ধ কাল, "দীর্ঘ এক বৎসর"—বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। চিত্তরঞ্জন কর্ত্তৃক বর্ত্তমান প্রবন্ধ রচনার তারিখও এই স্বীকারোক্তি এবং আভ্যন্তরিক প্রমাণে পাওয়া যায়।—সম্পাদক।

২। রামপ্রসাদ ও রামমোহন রচিত গান সম্পর্কে, বগুড়া

অভিভাষণে চিত্তরঞ্জন যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন,—তাহার মধ্য হইতে দু' চারিটি তুলিয়া দিতেছি।—সম্পাদক।

(ক) "বাঙ্গালার গীতি-কবিতার এই দ্বিতীয় পল্লবে আমরা রামপ্রসাদের যুগের সঙ্গে পরিচিত হইতে চেষ্টা করিব। আজু গোঁসাই, রামদুলাল, কমলাকান্ত প্রভৃতি সকলেই রামপ্রসাদকেই অনুসরণ করিয়াছেন।"

(খ) "রামমোহন আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালার সাহিত্য ধর্ম্ম ও গান—রামপ্রসাদের সুরে—তাঁহার আদর্শে মাতিয়া উঠিয়াছিল।"

(গ) "রামপ্রসাদ সে সুরে গাহিয়া গেলেন—**রামমোহন ঠিক তার উল্টা সুর ধরিলেন**। * * * রামমোহনের গান, গান নহে, জোর করিয়া মানুষকে বেদান্তের ঔষধ গেলান।"

[বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭]

রাজা রামমোহন সম্পর্কে ঐ বগুড়া অভিভাষণেই চিত্তরঞ্জন আরো অনেক রকমের কঠোর কথা বলিয়াছিলেন—তুলিয়া দিতেছি।

—সম্পাদক।

(ক) "এই যে ফেরঙ্গ কবিতা, বাঙ্গালার এবং মানুষের খাঁটী মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিয়া তৈয়ারী হইল, তাহার গুরু কে? তাহার গুরু রামমোহন রায়।" * * * "ফেরঙ্গ ভাষা ও ফেরঙ্গ যুগ আনয়নকারী রামমোহনকে বুঝিলে দেশের অনেকটা মঙ্গল হইবে। এবং তবেই আমরা এই ফেরঙ্গ যুগকে সমূলে পরিবর্ত্তন করিতে পারিব।

(খ) "জবরদস্ত মৌলবী রামমোহন * * মুসলমানেরা এক সঙ্গে যেমন নমাজ পড়ে, সেই অনুকরণে সমাজ গড়িলেন। পৌত্তলিকতার উপর এত বড় চোট দিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপর অযথা অন্যায় বিচার করিলেন। অবশ্য একথা মানি যে, বৈষ্ণব তখন শুকনো মালার ঠক ঠকিতে পরিণত হইয়াছিল। * * * রামমোহনের গ্রন্থাদি হইতে বৈষ্ণবের প্রতি অযথা বিদ্বেষ ও সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিক সাধনার প্রতি অযথা আসক্তি—এ সকলের প্রমাণ প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়; এমন কি, এই দুই সাধন পদ্ধতির সমালোচনায় তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বীদিগের জাতি তুলিয়া গাল দিতে ছাড়েন নাই।"

(গ) "তাই আমার মনে হয় যে—রামমোহন প্রতিভাশালী

রামপ্রসাদকে ছাড়িয়া রামমোহনের ব্রহ্ম সঙ্গীতে আসিবার পূর্ব্বে প্রসাদী সঙ্গীত সম্বন্ধে আরও দু' একটি কথা আমি বলিব। নাম জপ, রূপ ধ্যান হইতে আরম্ভ করিয়া রামপ্রসাদের গানের রূপান্তরে আমরা সাধনাঙ্গের অতি উচ্চ অবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। এই অবস্থার গানগুলিকে

মহাপুরুষ হইলেও—**বাঙ্গালার প্রাণের সঙ্গে তাঁহার (রামমোহনের) পরিচয় ছিল না।**"

[বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭]

রামমোহনের ব্রহ্ম সঙ্গীত সম্বন্ধে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাসে লেখকের অভিমত চিত্তরঞ্জনকে পাঠ করিয়া শুনান হইয়াছিল। বগুড়া অভিভাষণের পুর্ব্বে এবং পরেও, দুইবার। কিন্তু তাহা অভিনিবেশ সহকারে শুনিয়াও তাঁহার (চিত্তরঞ্জনের) মতের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, ইহা স্পষ্ট লক্ষ্য করা গিয়াছে।—নিম্নে ৺রামগতির অভিমতটি তুলিয়া দিতেছি। এই অভিমতটির প্রতিই চিত্তরঞ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছিল—। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। সম্পাদক।

"রামমোহন রায়ের যে আর একটী মহতী শক্তি ছিল, এ পর্য্যন্ত তাহার উল্লেখ করা যায় নাই। তিনি অত্যুৎকৃষ্ট গান রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার ব্রহ্ম সঙ্গীত বোধ হয় পাষাণকে আর্দ্র, পাষণ্ডকেও ঈশ্বরানুরক্ত ও বিষয় নিমগ্ন মনকেও উদাসীন করিয়া তুলিতে পারে। ঐ সকল গীত যেরূপ প্রগাঢ় ভাবপূর্ণ, সেইরূপ বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণী সমন্বিত; অনেক কলাবতে সমাদর পূর্ব্বক উহা গাইয়া থাকেন। তাঁহার রচিত প্রায় দেড় শত গান আমরা দেখিতে পাইয়াছি, তন্মধ্যে নিম্নভাগে দুইটি মাত্র উদ্ধৃত করিলাম—"

'মনে স্থির করিয়াছ চিরদিন কি সুখে যাবে।
জীবন যৌবন ধন মান রবে সমভাবে'॥
'মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর!
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।' * *

[বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য ৺রামগতি ন্যায়রত্ন পৃঃ ২১১-১২]

কেবল বাহির হইতে দেখিলে বুঝা যাইবে না। ইহার অঙ্গাঙ্গী সাধনরসে মনকে না ডুবাইতে পারিলে কল্পকলার রূপান্তরও হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

প্রসাদ গাহিতেছেন—

১। এবার কালী তোমায় খাব
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা
তুটার একটা করে যাব।
হাতে কালী মুখে কালী সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব
যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে সেই কালী তার
মুখে দিব।
খাব খাব বলি মাগো উদরস্থ না করিব
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে মনমানসে পূজিব।

ইহা কেবল একটি উচ্চাঙ্গের সাধন নয়। কল্পকলারও এক অতি বড় রূপান্তর। এই অবস্থাতেই সাধক আবার গাহিতেছেন—

২। এমন দিন কি হবে মা তারা
যবে তারা তারা তারা বলে তারা বেয়ে পড়বে ধারা।
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে,
মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে, তারা বলে হব সারা॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে, শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা॥

শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্বঘটে।
ওরে, আঁখি অন্ধ দেখ মাকে,
তিমিরে তিমিরহরা॥

"মা বিরাজে সর্ব্বঘটে" ইহাকেই আমি "সাক্ষাৎ দর্শন" বলিতে চাই। এই ভাবের অনুরূপ কথা অনেক পাওয়া যায়। কাব্যের রূপান্তরে কবি সাধন রাজ্যে কোথায়, কোন অবস্থার মধ্যে গিয়া পৌঁছিয়াছেন তাহা শুদ্ধ মনে অনুভব করিবার ক্ষমতাও হয়ত বা আজ আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। এই অবস্থাতেই সন্ধ্যাবেলায় মায়ের কোলের গ্রাম্য ব্যাকুল খেলা-শ্রান্ত সন্তানের গান—

৩। কেবল আসার আশা ভবে আসা, আশা মাত্র সার হলো *
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রলো॥

(*) "THE VANITY OF BIRTH AFTER BIRTH."
'Tis but the hope of hope this coming
Into the world, and ends in coming,
The black bees' error, when they fall
On lotus limned. The **nim** you call
Sugar, with **nim**-leaves **you** to feed
This one deceiving! In my greed,
Mother, for sweets my day have I
With embittered lips and wry
Spent. You saying: "Let us play,"
Have brought me, Mother, this earth-way;
But in the game played me around.
My hope has no fulfilment found.

মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় ক'রে ছলো।
ও মা! মিঠার লোভে তিত মুখে সারা দিনটা গেল।
মা খেল্‌বি বলে ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলো।
এবার যে খেলা খেলালে মা গো, আশা না পূরিলো॥
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায় যা হবার তাই হলো
এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে,
ঘরে নিয়ে চলো॥ (১)

"What was to be, in the world-play,
Has been," suffer Prasad Say.
'Drawing your child now to your side,
Go you home at eventide."

—"Bengali Religious Lyrics" Sakta
Selected and translated by Edward J
Thompson and Arthur Marshman Spencer.

(১) "তারপর অকস্মাৎ কোন শুভ মুহূর্ত্তে রামপ্রসাদের জন্ম হইল। দেশ আবার গানের আস্বাদ পাইল। বৈষ্ণব কবিদের ঘর সংসার ঘেরিয়া যে কাব্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপরে তিনি (রামপ্রসাদ) নূতন রসের অনুভূতি দেখাইলেন। তিনি গাহিলেন—

ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল।
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।

এও সেই বৈষ্ণবের অহৈতুকী ভক্তির কামনা। বাঙ্গালা আবার সেই সুর খুঁজিয়া পাইল, সাধকের সাধনা, ভাবের সাধনা ফুটিয়া উঠিল। রামপ্রসাদ গাহিলেন—

এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো।

এও সেই দেশের কথা, যে দেশের গান চণ্ডীদাস গাইয়াছিলেন।" (বাঁকীপুর অভিভাষণ। ১৯১৬)

মানুষ যখন প্রেমের ভিতর দিয়া স্বাধীন হয়, মিলিত হয়, তখন সে নির্ব্বাণ-মুক্তি চায় না।

* * তাই রামপ্রসাদ গাইয়াছিলেন "চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।" ইহার সঙ্গে **মহাপ্রভুর "মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবদ্ভাক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি"** মিলাইয়া একই সুরের, একই ভাবের, একই স্রোতের টানে চলিয়াছে। শাক্ত ও বৈষ্ণব বাঙ্গালার প্রাণের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। বাঙ্গালার প্রাণ ধর্ম্মের সঙ্গে তাঁহাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। (বগুড়া অভিভাষণ, ১৯১৭)

বর্ত্তমান রামপ্রসাদ-প্রবন্ধে যে সকল কথা চিত্তরঞ্জন বিশদ ও বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রমুখ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য আলোচনার সময়ে সেই সকল কথাই তিনি সূত্রাকারে বলিয়া রাখিয়াছেন। রামপ্রসাদ রচনার বহুপূর্ব্ব হইতেই, এই কবির কাব্য সম্বন্ধে তিনি একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। বাঁকীপুর ও বগুড়া অভিভাষণে আমরা দুইটি জিনিষ পাই। ১ম, রামপ্রসাদ ও চণ্ডীদাস একই দেশের গান গাহিয়াছেন। ২য়, শাক্ত-রামপ্রসাদ বৈষ্ণবীয় ভক্তিপন্থী ছিলেন। কেননা, বাঙ্গালার শাক্ত ও বৈষ্ণব মূলে এক। এবং রামপ্রসাদের উপর বৈষ্ণব-প্রভাবের নিদর্শনও এইখানেই পাওয়া যায়। সম্পাদক।

বাঁকীপুর ও বগুড়া অভিভাষণে চিত্তরঞ্জন যে গানটী বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধেও উল্লেখ করিয়াছেন, Sister Nivedita ঐ গানটির ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া সেই সঙ্গে তাঁহার নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। সম্পাদক।

"The books say, man dying in Benares
Attains Nirvana.
I believe it. Siva has said it.
But the root of all is devotion
And freedom is her slave.
What good is there even in Nirvana ?
Mixing water with water—
So I do not care to **become sugar,**
I want to **eat** Sugar !"

৪। সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না। †

"What a flash is in those last two lines! The shrewd mother-wit of a peasant joins with the insight of a great poet, not only to express the finest of five emotions—the joy of being the inferior, but to hint in the same words, at the secret of existence."

(Two Saints of Kali—by Sister Nivedita) p—54

[প্রসাদী স্বর—একতালা]

(†) সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না।
ভাল পেয়েছ তবে কাল বিছানা॥
এই যে সুখের নিশি, জেনেছ কি ভোর হবে না।
তোমার কোলেতে কামনা কান্তা
তারে ছেড়ে পাশ ফেরো না॥
আশার চাদর দিয়েছ গায়, মুখ ঢেকে তাই মুখ খুল না।
আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে, রজক ঘরে তায় কাচ না॥
খেয়েছ বিষয় মদ, সে মদের কি ঘোর ঘোচে না।
আছ দিবানিশি মাতাল হ'য়ে, ভ্রমেও কালী বল না॥
অতি মূঢ় প্রসাদ রে তুই, ঘুমায়ে আশা পূরে না।
তোর ঘুমে মহা ঘুম আসিবে,
ডাক্‌লে আর চেতন পাবে না॥

"THE SOUL'S SLEEP OF DEATH"

Drowsy with longing, you wake not : excellent you have found
Time's bed. From this right of bliss, think you, will be no dawn ?
Desire sits in your lap, like to a harlot crowned.
You will not turn from her. The sheet of hope is drawn

এই সমস্ত গানগুলিতে সাধক জীবনের এক অতি উচ্চ অবস্থার মধ্যেও কত বৈচিত্র্য বিদ্যমান—এক দিকে যেমন তাহার নিদর্শন—আবার অন্যদিকে কবির কল্পকলার কি চরমোৎকর্ষ তাহারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা পাই।

সাধন না জানিয়া, সিদ্ধ না হইয়া কেবল তর্ক দ্বারা ব্রহ্ম-নিরূপণের কথাকে রামপ্রসাদ 'দেঁতোর হাসি' বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ, ভেদ-অভেদ, জড়-চৈতন্য, প্রভৃতি তত্ত্ব নিরূপণ কল্পকলার উদ্দেশ্য নয়।

Over your body ; face muffled, to uncover you refuse ;
Winter and Summer alike an unwashed cloth you use.
You are held down by the stupor of the wine that you have drunk—
The wine of worldly possession—and you utter not Kali's name ;
Not even absent-mindedly. O foolish Prasad, so sunk,
In hunger for sleep, that sleep does not appease the same ;
In this your sleep the great sleep, the last that comes to all,
Will come, and you will wake not, although we call and call.

—"Bengali Religious Lyrics" Sakta
Selected and translated by Edward J
Thompson and Arthur Marshman Spencer.

তবে কল্পকলা যদি জীবনের অভিব্যক্তি হয়, তবে তত্ত্ব রূপে রসে কল্পকলায় ফুটিয়া উঠে। রামপ্রসাদের গানেও তাহাই হইয়াছে। এ গান সমগ্র জীবনের গান। ইহা জীবনের কোন অংশের গান নয় (১)। ইহার কোন অংশকে সমগ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে অংশকে বুঝা যাইবে না।

১। চিত্তরঞ্জন, রামপ্রসাদের গান সম্বন্ধে যাহা বলিলেন চণ্ডীদাসের গান সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলিয়া আসিয়াছেন যে,—এই গান চণ্ডীদাসের জীবনের কোন অংশের গান নয়, পরন্তু চণ্ডীদাসের সমগ্র জীবনের গান।

এই প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জনের যাহা সিদ্ধান্ত তাহা তুলিয়া দিতেছি।

(ক) "আমরা জীবনটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিতে শিখি নাই। আমাদের ধর্ম্ম,—জীবনের কোন একটা বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না।"

(রূপান্তরের কথা। ১৯১৭। মার্চ্চ)

(খ) ইন্দ্রিয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কোন ভাব, কোন সত্তা আজিও মানুষের ভিতরে অনুভব হয়, এমন বিশ্বাস আমার নাই। ইন্দ্রিয় যাঁহার সৃষ্টি, অতীন্দ্রিয়ও তাঁহারই সৃষ্টি। ইন্দ্রিয়কে অস্বীকার করিয়া অতীন্দ্রিয়ের উপর জীবনের কোন ভিত গাঁথা যায় কি? কেহ আজিও পারিয়াছেন কি? * * এই ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই শুদ্ধি, ভোগ ও ভুক্তি প্রতিষ্ঠিত। এ ইন্দ্রিয় ভাগবত ভোগের ইন্দ্রিয়। * * এ ভোগ ভাগবত ভোগ। বাঙ্গালার গীতি কবিতার মর্ম্মে মর্ম্মে এই ভোগের পরিচয় পাওয়া যায়।"

(বগুড়া অভিভাষণ, ১৯১৭)

(গ) "কলাবিদের জীবন এই ধারায় গঠিত। পাপ পুণ্যের বিচার তাঁহার নাই। পাপও সত্য পুণ্যও সত্য।"

(বাঁকীপুর অভিভাষণ, ১৯১৬)

(ঘ) "জীবনকে অপবিত্র করে কাহার সাধ্য? জীবের জীবন যে ভগবানের লীলা, সেই লীলাময়ের লীলায় হস্তক্ষেপ করে, এমন অহঙ্কার এমন দাম্ভিকতা কার? * * মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে কি ভগবানের

প্রসাদ গাহিয়াছেন—

১। এই দেখ সব মাগীর খেলা।
মাগীর আপ্তভাবে গুপ্তলীলা॥
সগুণে নির্গুণে বাঁধিয়ে বিবাদ
ডেলা দিয়ে ভাঙ্গে ডেলা॥

সাড়া পাওয়া যায় না? আজও কি শ্রীচৈতন্যের দেশে একথা শুনিতে হইবে যে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের খেলা শয়তানের খেলা? * * * এমন হতভাগ্য কি কেহ আছে যে, তাহার ইন্দ্রিয়ের যে ভোগ, তাহার মধ্যে অতীন্দ্রিয়ের সে ডাক একেবারেই শুনিতে পায় নাই?"

(রূপান্তরের কথা। ১৯১৭)

মানুষের জীবনকে অখণ্ড ও সমগ্র ভাবে দেখিবার যে যুক্তি ও ভাব চিত্তরঞ্জনের মনে সর্ব্বদাই জাগ্রত ছিল, উপরে উদ্ধৃত উক্তিগুলি তাহার কিছু আভাস দিবে।

ইহা ছাড়া একটা জাতির জীবনকে এবং সেই জাতীয় জীবনের ইতিহাসকেও তিনি এক এবং অখণ্ড ভাবেই দেখিয়াছেন। জাতির জীবনকেও তিনি ভাগ করিয়া, এক অংশ হইতে অপর অংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই। পরন্তু সমগ্র ভাবেই দেখিয়াছেন। দৃষ্টান্ত দিতেছি।—সম্পাদক।

—"আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইংরাজের যাহা কিছু ভাল আমরা লইব, আমাদের যাহা কিছু ভাল তাহা ইংরাজ লইবে, এবং উভয়ের যাহা কিছু মন্দ তাহা বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

"এ কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারি না। আমাদের কিংবা ইংরাজের, যাহা ভাল আর যাহা মন্দ, তাহা কি এমন পৃথক ভাবে জাতির জীবনের মধ্যে অবস্থিতি করে যে, একটা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া আর একটা লওয়া যায়? একটা বিশিষ্ট জাতির ভাল মন্দ যে এক সঙ্গে সেই জাতির রক্ত মাংসের সঙ্গে জড়ান।

[চিত্তরঞ্জন কর্ত্তৃক ভবানীপুর, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, ১৯১৭।]

২। অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব ভেদ ভাবে শিবাশিব
উভয়ে অভেদ পরমাত্মা স্বরূপিণী।
মায়াতীত নিজে মায়া উপাসনা হেতু কায়া
দীন দয়াময়ী বাঞ্ছাধিক ফলদায়িনী ॥

'অনেক সাহিত্যিক প্রমাণ করিতে ব্যস্ত যে, রামপ্রসাদ মূর্ত্তি পূজার বিরোধী ছিলেন। এবং তাঁহার সমস্ত সাধক-জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত গানগুলির মধ্য হইতে দুই একটি ছিঁড়িয়া ফাড়িয়া প্রমাণ করিতে চান **রামপ্রসাদ রাম-মোহনের মতই মূর্ত্তি-দ্বেষী** (১)। রামপ্রসাদের সাধন ও কাব্যকে ইহার চেয়ে ভুল বুঝা আর কিছুতেই হইতে পারে না। এই একটি ছত্রে দেখুন "মায়াতীত নিজে মায়া উপাসনা হেতু কায়া" শিব, শিবা অভেদ এক মায়াতীত অথচ তিনি নিজে মায়া। মায়া তাহা হইতে স্বতন্ত্র কিছু নয়। মায়া মিথ্যাও নয়। এখন কায়া ?

(১) 'ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তা জান না।
মাটির মূর্ত্তি গড়িয়ে মন তার করতে চাওরে উপাসনা'।
'ধাতু পাষাণ মাটি মূর্ত্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে।'

প্রভৃতি কথা তিনি (রামপ্রসাদ) রাজা রামমোহনের পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত গানের সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের "আহ্বান বিসর্জ্জন কর তুমি কার।" প্রভৃতি গান এক স্থলে রক্ষিত হইবার যোগ্য।" * * * * [বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—ডাঃ দীনেশ সেন]

রামপ্রসাদের কাব্য সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন ডাঃ দীনেশ সেনের মতবাদকে বহুস্থানেই প্রতিবাদ করিয়াছেন। এক্ষেত্রেও তাহারি একটা দৃষ্টান্ত মাত্র।—সম্পাদক।

সাধকের উপাসনা হেতু তাহার কায়া বিদ্যমান, কায়া সত্য। মায়াতীত হইতে মায়া ও কায়া সর্ব্বত্রই তিনি। এবং এই কায়া উপাসনা হেতু। ইহা কি মূর্ত্তি-বিদ্বেষের প্রমাণ ? তিনিই

১। সগুণা নির্গুণা স্থূলা সূক্ষ্মা মূলা হীনমূলা
মূলাধার অমলকমলবাসিনী।
আগম নিগমাতীত তিনি মাতা তিনি পিতা
পুরুষ প্রকৃতিরূপিণী। (২)

২। উপাসনা ভেদাভেদ ইথে কোন নাহি খেদ
মহাকালী কাল পদভরে।

(২) "জগৎকারণকে—মা বলিয়া, জগদম্বা বলিয়া ডাকা একমাত্র ভারতেই দেখিতে পাওয়া যায়। * * জগদম্বা সগুণা এবং নির্গুণা উভয়ই। পুরুষ ও প্রকৃতি, ব্রহ্ম ও মায়া বলিয়া ভারতের দর্শনকার যে দুই পদার্থ জগতের মূলে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উহা একই বস্তুর একই কালে বিদ্যমান দুই বিভিন্ন ভাব বা প্রকাশ বিশেষ। * * মানবমন দেশকালাবচ্ছিন্ন সগুণ ভাবের উপলব্ধির সময় জগদম্বার নির্গুণ ভাব উপলব্ধি করিতে পারে না। এবং সমাধি সহায়ে উচ্চ ভূমিকায় আরোহণ করিয়া যখন সে জগন্মাতার নির্গুণ স্বরূপের প্রত্যক্ষ করে, তখন আর তার নয়নে তাঁহার সগুণ ভাবের ও সগুণ ভাব-প্রসূত জগতের উপলব্ধি হয় না। তবে সমাধিভূমি হইতে নামিয়া পুনরায় সাধারণ ভাব প্রাপ্ত হইলেও, তাহার সমাধিকালানুভূত জগদম্বার নির্গুণ ভাবের যে কতকটা স্মৃতি থাকিয়া যায়, তাহাতেই সে নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারে, তিনি নির্গুণা ও সগুণা উভয়ই। * * প্রতীকাবলম্বনে শক্তিপূজা ঐ সমাধি লাভের সহায়ক।"

(ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ পৃঃ ১০৵০)

নিদ্রা ভাঙ্গে যার ঠাঁই তার আর নিদ্রা নাই
থাকে জীব শিব কর তারে।

রামপ্রসাদের এই মাতৃভাবের সাধনায় মূর্ত্তি-পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া জীব শেষে শিব হইয়া যায়। শিব ও শক্তি তত্ত্বকে অনেক দার্শনিক অদ্বৈতবাদের একটা রূপক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জীবন কোন 'বাদ' নয়। কোন 'বাদের' মধ্যে জীবনকে বাঁধা যাইতে পারে না। আমি বলি শঙ্করকে তর্জ্জমা করিয়াও বাঙ্গালী শিবশক্তির উপাসনা গ্রহণ করে নাই, মাধ্বকে তর্জ্জমা করিয়াও বাঙ্গালী রাধাকৃষ্ণের ভজন আরম্ভ করে নাই(৩)।

(৩) তন্ত্রশাস্ত্রবিৎ মহামতি উড্রফ্ সাহেব শাঙ্কর বেদান্ত মতে মুক্তি আর শাক্ত মতে মুক্তির তুলনায় বিচার করিয়া উভয়ের পার্থক্য The Shakti and Shakta গ্রন্থে দেখাইয়াছেন। চিত্তরঞ্জনকে উহা পাঠ করিয়া শুনান হইয়াছিল। তিনি শুনিয়া অত্যন্ত খুসী হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে মাধ্ব সম্প্রদায়ের শাখা নয়, ইহার প্রমাণ চৈতন্য চরিতামৃতেই আছে। যথা—

মধ্বাচার্য্য স্থানে আইলা, যাঁহা তত্ত্ববাদী।
উড়ুপ কৃষ্ণ দেখি তাঁহা হৈলা প্রেমোন্মাদী॥
প্রভু কহে কর্ম্মী জ্ঞানী দুই ভক্তি হীন।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন॥

(চৈ, চঃ, মধ্য লীলা। নবম পরিচ্ছেদ)

১৭২১ খৃঃ রাজপুতনায় গলতা নগরে যে বিচার সভা হয়, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ ঐ বিচার সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি যদি ঐ সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণবকে যে কোন কারণে মাধ্ব সম্প্রদায়ের শাখা বলিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, তবে তাহা চৈঃ চরিতামৃতের বিরোধী সিদ্ধান্ত। শ্রীজীব গোস্বামীও গৌড়ীয় বৈষ্ণবকে মাধ্বের শাখা বলেন নাই। বিশেষতঃ ইঁহারা কেহই শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করেন নাই। পূর্ব্বগামী

শঙ্কর ও মাধ্ব চিরকালই শঙ্কর ও মাধ্ব থাকুন। এবং বাঙ্গালীও চিরকাল বাঙ্গালীই থাকুক। আমি বলি বাঙ্গালার শিবশক্তি, কৃষ্ণরাধা, শঙ্কর ও মাধ্বের দর্শনের রূপক ব্যাখ্যা নয়। এই তুই বিচিত্র সাধনা বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপ হইতেই জন্মিয়াছে। ইহা বাঙ্গালার বাহিরের কোন কিছুর নকল বা তর্জ্জমা নয়—হইতেই পারে না। যে শঙ্কর অদ্বৈতে জগৎ মায়া বলিয়া উপেক্ষিত, বাঙ্গালার শক্তিতত্ত্ব তাহার নকল ত দূরের কথা তাহার স্পষ্ট প্রতিবাদ। রামপ্রসাদের সাধনতত্ত্বে ও কল্পকলায় জগৎ মায়া বলিয়া উপেক্ষিত হয় নাই (১)। ইহা যে হয়

গোস্বামীদের মুখে শ্রীচৈতন্য দেবের ধর্ম্মের কথা শুনিয়াছেন। কিন্তু মতবাদ ইঁহাদের নিজ নিজ প্রতিভার সৃষ্টি। যদি পরবর্ত্তীদের মতবাদ চৈতন্যদেবের উপর আরোপ করা হয়, তবে তাহা অনৈতিহাসিক। কাজেই সত্য নহে। চিত্তরঞ্জনও স্বীয় প্রতিভাবলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মকে মাধ্ব সম্প্রদায়ের শাখা বলিয়া স্বীকার করিলেন না। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মকে মাধ্ব সম্প্রদায়ের শাখা বলিতে অভ্যস্ত, চিত্তরঞ্জনের কথা তাঁহাদের প্রণিধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।—সম্পাদক।

(১) চিত্তরঞ্জন বৈদান্তিক মায়াবাদের বিরোধী ছিলেন। এমন কি গোস্বামী সিদ্ধান্তে বৈষ্ণবীয় প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃতের ভেদও তিনি স্বীকার করিতেন না। প্রাকৃতের মধ্যেই তিনি অপ্রাকৃত দেখিতেন। প্রত্যক্ষ-ই তাঁহার নিকট ছিল 'আদর্শ'। তিনি সম্ভবতঃ স্বভাব-বাদী অথবা জীবন-বাদী ছিলেন। তাঁহার কথা হইতেই প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার 'প্রত্যক্ষে' যদি আদর্শ না থাকিত, তবে তিনি পুরা প্রত্যক্ষবাদী হইতেন। আবার তাঁহার 'আদর্শে' যদি 'প্রত্যক্ষ' না থাকিত, তবে তিনি পুরা আদর্শবাদী হইতেন।—সম্পাদক।

(ক) শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্ Idealistও নয়, Realistও নয়। সে Naturalist শুধু ভাব লইয়াও সে স্বপ্নের দেশে ফুল ফুটায় না, আবার শুধু দেহের রস-রক্তের সন্ধানেই কাটায় না।"

(খ) "আদর্শ জগৎ-ই এই প্রত্যক্ষ জগৎ। বেদান্তের মায়াবাদ ভুল। এ প্রাণ সত্য, এ শ্রবণ সত্য, এ চক্ষু সত্য, এ রূপ সত্য, প্রতি অনুরেণু ধূলিকণা হইতে এই মহাবিশ্ব এক জাগ্রত প্রাণময় সত্য। মায়া বলিয়া কোন জিনিষই নাই। জগন্মিথ্যা নয়।

[বাঁকীপুর অভিভাষণ, ১৯১৬]

(গ) "মায়া বলিয়া এই জাগ্রত বিশ্বের বিচিত্রতার মধ্যে মায়াধীশকে খাড়া করিয়া, সকল বিশ্বকে বুদ্ধির প্রাখর্য্যের দ্বারা ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বিশ্ব উড়িয়া যায় না। মায়াও আপনার প্রকৃত রূপে দেখা দেয় না। [বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭]

চিত্তরঞ্জন, রাজা রামমোহনের উপর স্পষ্টতঃই বিরূপ ছিলেন। তাহার অনেক কারণের মধ্যে একটি কারণ, রামমোহনকে, চিত্তরঞ্জন, মায়াবাদী এবং শাঙ্কর বেদান্তী মনে করিতেন। আরো অনেকে রামমোহনকে শাঙ্কর বেদান্তী মনে করিয়া থাকেন। যথা—"He (Rammohon) was a scholastic, mediaeval বা Sankarite Vedantist" The philosophy of Brahmaism, P. 6. by Pandit Sitanath Tattvabhuson রামমোহন নিজেও শঙ্কর শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া গর্ব্ব অনুভব করিয়াছেন। আবার রামমোহন পুরা শাঙ্কর বেদান্তী নন্, অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি এ মতও পোষণ করেন। চিত্তরঞ্জন যে মায়াবাদ-বিরোধী ছিলেন তাহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহার কথা হইতেই উদ্ধার করিতেছি।

(ঘ) "এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে মায়া নয়, আর ইষ্ট দেবতা ভগবান যে এই আমাদেরি মত সুখ, দুঃখ ভোগ করিয়া লীলার মধ্যে আনন্দঘন চিন্ময়রস আস্বাদন করিতেছেন, "শঙ্কর শিষ্য রামমোহন তাহা বুঝেন নাই।" * * "আশা করি, রামমোহনের এই বেদান্তী মায়াবাদী ভ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত, বুদ্ধির প্রাসাদের সমস্ত **খিলান** আলোচনা করিয়া সুধীজন দেখিবেন।" [বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭]

সুতরাং রামপ্রসাদকে চিত্তরঞ্জন মায়াবাদবিরোধী বলিয়া যে প্রতিপন্ন করিবেন, ইহা চিত্তরঞ্জনের পক্ষে স্বাভাবিক। এবং তাঁহার সিদ্ধান্তও অভিনব।—সম্পাদক।

নাই তাহার সব চেয়ে বড় কারণ যে ইহা বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপ হইতে জন্মিয়াছে। যে প্রাণের স্বরূপ হইতে বৈষ্ণবের লীলাতত্ত্ব জন্মিয়াছে সেই প্রাণের স্বরূপ হইতেই শক্তি তত্ত্বও জন্মিয়াছে। তাই বাঙ্গালীর লীলাতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব অভেদ।

রামপ্রসাদের—

ভেবে দেখ মন, কেউ কারু নয়
মিছে ফের ভূমণ্ডলে।
দিন দুই তিনের জন্য ভবে
কর্ত্তা বলে সবাই বলে।

ইহা মায়াবাদ নয়। ইহা মায়াবাদী সন্ন্যাসীর সংসার-বৈরাগ্যও নয়। উহা শুধু উদ্‌ভ্রান্ত বাসনারাশিকে গুছাইয়া আনিয়া—সাধনে ঐকান্তিক নিষ্ঠা জন্মাইবার জন্য একটা ব্যাকুলতা মাত্র।

তারপর এই যে গানটি—

ওরে নগর ফির মনে কর প্রদক্ষিণ করি শ্যামা মারে
যত শুন কর্ণপুটে সকলি মায়ের মন্ত্র বটে—
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে (১)।
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে
ওরে আহার কর মনে কর আহুতি দেই শ্যামা মারে।

(১) মহামতি উড্রফ সাহেবের The Shakti and Shakta গ্রন্থের "Garland of Letters" প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। তাহাতে তান্ত্রিক "বর্ণমালার" ব্যাখ্যা আছে।

—যেমন চণ্ডীদাসের সহজিয়া পদগুলির অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া তাহার

ইহা সাধনার প্রথমাবস্থার গান নয়। ইহা সেই সময়ের গান যখন মাকে বলা হইতেছে—

"ওরে মন বলি ভজ কালী ইচ্ছা হয় যেই আচারে।" কোন বিশেষ আচারের যখন আবশ্যক হইতেছে না, এবং "যত শোন কর্ণপুটে সকলি মায়ের মন্ত্র বটে" অর্থাৎ কোন বিশেষ মন্ত্রেরও প্রয়োজন নাই। এ অবস্থায়ও জগৎ মায়া বলিয়া উপেক্ষিত ত হইলই না, বরং ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে দেখা দিতে লাগিলেন। ইহা বৈষ্ণবের সেই সাধনা—"যাহা যাহা নেত্র যায়—তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" স্বগুণ ও কায়া বাদ দিয়া নির্গুণ ও মায়াবাদের যে সাধনা—তাহা রামপ্রসাদের কল্পকলায় বা সাধনে পাওয়া যায় না।

মন কর কি তত্ত্ব তারে
ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত
অভাবে কি ধর্ত্তে পারে।
সে যে ভক্তি রসের রসিক
সদানন্দে বিরাজ করে পুরে।

ইহা ভক্তির গান, ভাব ও রসের সৃষ্টি—ইহাকে অভাবে ধর্ত্তে পারা যায় না।—কেন না ইহা তো অভাবের গান নয়।

কোন ইংরেজী অনুবাদ হয় নাই, তেমনি রামপ্রসাদের সাঙ্কেতিক চিহ্ন সমন্বিত তত্ত্ব ও সাধন সম্পর্কীয় গানগুলিরও কোন অর্থ নিরূপণ বা ইংরেজী অনুবাদ হয় নাই। হইলে ভাল হয়।—সম্পাদক।

অদ্বৈতবাদীর যে মুক্তি রামপ্রসাদ তা জানিতেন। বেদান্তের তত্ত্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালী একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিল ইহাও এক অতি বড় মিথ্যা কথা। যেমন আজও যাঁহারা জানিবার তাঁহারা জানেন তেমনি শতাব্দী পূর্ব্বে যাঁহাদের বেদান্ত জানিবার কথা তাঁহারা জানিতেন

বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে
এই বাদানুবাদ করে সকলে ?
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেহ বলে সালোক্য পাবি, কেহ বলে সাযুজ্য মেলে।
বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ ঘটের নাশকে মরণ বলে,
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয় জল হয়ে সে মিশায় জলে।

কিন্তু রামপ্রসাদ 'জল হয়ে সে মিশায় জলে' চাহেন নাই। সাধনের অতি উচ্চ অবস্থাতেও—

আবার দু আঁখি মুদিলে দেখি অন্তরেতে মুণ্ডমালী (১)।

তিনি জানেন যে

কাশীতে মরিলে শিব দেন 'তত্ত্বমসি'।

ওরে, তত্ত্বমসির উপরে সেই মহেশ-মহিষী।

(১) শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবও, তোতাপুরী কর্ত্তৃক নির্বিকল্প সমাধি শিক্ষালাভ কালে, সমাধি অবস্থায় উপনীত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেও শ্রীরামপ্রসাদের মতই "দু আঁখি মুদিলে অন্তরেতে মুণ্ডমালী" দেখিতেন. এইরূপ শুনা যায়।—সম্পাদক।

রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভাল নাত বাসি
ঐ যে গলাতে বেঁধেছে আমার কালী-নামের ফাঁসী (*)।

আর একটা গান—

নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি। (২)

ইহাই শঙ্কর মুক্তির স্পষ্ট প্রতিবাদ। বাঙ্গালার বৈষ্ণব যে সে—

নরক বাঞ্ছয়ে তবে সাযুজ্য না লয়।

(*) Who dies at Kasi,
By him the Siva-ken of truth is seen ;
Above that ken enthrones Mahesa's Queen.
What cares Prosad for Kasi to be bound,
With Kali garlanded his neck around ?

—By E. J. Thompson and
A. M. Spencer.

(২) রামপ্রসাদের এই গানটি চিত্তরঞ্জন যথাক্রমে বাঁকীপুর, বগুড়া ও বর্দ্ধমান প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, মোট তিনবার উল্লেখ করিয়াছেন। Sister Nivedita এই গানটিকে অনুবাদ করিয়া, পুনরায় সমালোচনাও করিয়াছেন। ইহাতে এই গানটির গুরুত্ব সূচিত হইতেছে।

ডাঃ দীনেশ সেন বলেন "তাঁহার (রামপ্রসাদের) নির্ম্মল অদ্বৈতবাদ সূচক অসংখ্য পদ দৃষ্ট হয়"। সুতরাং দীনেশবাবু প্রসাদী সঙ্গীত ও রামমোহনের ব্রহ্ম সঙ্গীতকে এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেখিয়াছেন।

কিন্তু চিত্তরঞ্জনের দৃষ্টি অন্যদিকে এমন কি বিপরীত দিকে। সুতরাং রামপ্রসাদের উপর ভক্তিপন্থী বৈষ্ণবীয় প্রভাব তিনি স্বভাবতঃই নিপুণ বিশ্লেষণের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। চিত্তরঞ্জনের রাম-প্রসাদ সমালোচনা অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণমূলক এবং সম্পূর্ণ মৌলিক।

—সম্পাদক।

ইহাই বাঙ্গালার শাক্ত ও বৈষ্ণবের অভেদাত্মার নিদর্শন। রামপ্রসাদকে মূর্ত্তিদ্বেষী প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনেকে (৩) উদ্ধার করেন—

১। ধাতু পাষাণ মাটী মূর্ত্তি কাজ কি রে তোর সে গঠনে ?

২। ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তা জান না ?
মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়ে মন তার করতে চাওরে উপাসনা ?

কিন্তু ইহা কি কালাপাহাড়ী মূর্ত্তি-বিদ্বেষ ? ইহা মাত্র সাধনের এক স্তর হইতে অন্য স্তরে উঠিবার জন্য উদ্যম ও ব্যাকুলতা।

যখন "কালো মেঘ উদয় হলো অন্তর অম্বরে" তখন এবং কেবল মাত্র তখনই—ধাতু পাষাণ মাটি মূর্ত্তির কাজ নাই। যখন ত্রিভুবন মায়ের মূর্ত্তির জ্ঞান হইল তখনি মাটীর মূর্ত্তির কাজ নাই। কিন্তু যাদের দৃষ্টিতে ত্রিভুবন মায়ের মূর্ত্তি হইয়া উঠে নাই, বাহিরে মেঘ দেখিয়া যাদের অন্তরে কালোমেঘ উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৌতুকে মানস শিখি নৃত্য করিয়া

---

(৩) চিত্তরঞ্জন এখানে স্পষ্টতঃ ডাঃ দীনেশ সেনকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে দীনেশ বাবু রাজা রাম-মোহনের মুর্ত্তি বিরোধিতার সিদ্ধান্তে রামপ্রসাদকেই অগ্রগামী বলিয়াছেন।

"রাজা রামমোহন রায় গভীর শাস্ত্রানুসন্ধান পূর্ব্বক যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, রামপ্রসাদ নির্ম্মল ভক্তি বিহ্বলতায় তৎপূর্ব্বেই সেগুলি হৃদয়ে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

[বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—ডাঃ দীনেশ সেন]

চিত্তরঞ্জন বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই কথার স্পষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই দুই জনের মূর্ত্তি বিরোধিতায় বাহিরের বা বাক্যের সাদৃশ্য অপেক্ষা ভিতরের বা ভাবের বৈষম্য অনেক বেশী।—সম্পাদক।

উঠে না, তাহাদের জন্য কি রামপ্রসাদের সাধনায় কালাপাহাড়ী বিদ্বেষ-মুদ্গরের ব্যবস্থা আছে ?

ইহা কোন্ অবস্থার কথা ? কোন্ অধিকারের কথা ? বাহিরে মেঘ দেখিয়া সাধক গাহিয়া উঠিলেন—

কালো মেঘ উদয় হলো অন্তর অম্বরে
নৃত্যতি মানস শিখি কৌতুক বিহরে
* * *
ইহ জন্ম পর জন্ম বহু জন্ম পরে
রামপ্রসাদ বলে আমার জন্ম হবে না জঠরে।

একদিন বাঙ্গালার আকাশে মেঘ উদিত হইলে—শ্রীরাধিকার নয়নের তারা স্থির হইয়া যাইত—'কেন মেঘ দেখে রাই অমন হলি ?'

আবার সেই বাহিরের মেঘ—মেঘবরণীরূপে অন্তর অম্বরেও উদয় হইত। কিন্তু আজ বাঙ্গালার আকাশের মেঘ ছিনিয়া সে রূপের নিছনি আর কে কাব্যে ফুটাইবে ? তেহি দিবসো গতা—।

রামপ্রসাদকে অনেকে যেমন মূর্ত্তিদ্বেষী তেমনি তীর্থ মাহাত্ম্যের অস্বীকারকারী বলিয়াও বলিয়াছেন। (১)

(১) এখানেও ডাঃ দীনেশ সেনকেই লক্ষ্য করা হইতেছে। সম্পাদক।

"কি কাজরে মন যেয়ে কাশী ?"
নানা তীর্থ পর্য্যটনে শ্রমমাত্র পথ হেঁটে।

প্রভৃতি বাক্যে তিনি (রামপ্রসাদ) তীর্থ যাত্রার সম্বন্ধে লৌকিক আস্থার প্রতি নির্ভীক ভাবে কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন।"

[বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—ডাঃ দীনেশ সেন]

ইহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। বস্তুতঃ সাধনের প্রথমাবস্থায় রামপ্রসাদ তীর্থে গমনের জন্য বহু গানে তাঁহার প্রাণের ব্যাকুলতা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

১। আমি কবে কাশীবাসী হব
সেই আনন্দ কাননে গিয়া নিরানন্দ নিবারিব,
গঙ্গাজল বিল্বদলে বিশ্বেশ্বর নাথে পূজিব
ঐ বারাণসীর জলে স্থলে ম'লে পরে মোক্ষ পাব।

২। "অন্নপূর্ণার ধন্য কাশী" প্রভৃতি গানগুলি তীর্থ-বিদ্বেষী নহে।

তবে "কি কাজরে মন যেয়ে কাশী" প্রভৃতি গানগুলি সাধনের সেই অবস্থার পরিচয় দেয়—যখন সর্ব্ব ঘটে ব্রহ্মময়ী বিরাজ করেন দেখা যায়—যখন

মা—ভক্তে ছলিতে তনয়ারূপেতে
বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া।

তখন তীর্থে যাইবার কি প্রয়োজন থাকে?

তারপর কতকগুলি অভিমানাত্মক গানে রামপ্রসাদ তীর্থে যাওয়ার বিরুদ্ধে গাহিয়াছেন। গঙ্গাকে তিনি বিমাতা জানিতেন। কাজেই গঙ্গাতীরে তীর্থবাস কালীর তনয় হইয়া তিনি করিতে পারেন না।

কেন গঙ্গাবাসী হব?
ঘরে ব'সে মায়ের নাম গাইব।
আমি এমন মায়ের ছেলে হইয়ে বিমাতাকে মা বলিব।

ইহা তীর্থের প্রতি বিদ্বেষ নয়। লৌকিক সংস্কারের প্রতিও কটাক্ষ নয়। ইহা কাব্যের, ইহা সাধনার রূপান্তর। ইহা সেই বিধি নিষেধের অতীত অবস্থার কথা, যখন সাধক গাহিয়াছেন—

"এবার আমি ভাল ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি ॥
যে দেশেতে রজনী নাই,
সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা,
সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি ॥
ঘুম ছুটেছে, আর কি ঘুমাই যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি ॥
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোণাতে রং ধরায়েছি।
মণি-মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি ॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে,
ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি ॥" (২)

(২) Sister Nivedita এই গানটির নিম্নলিখিতরূপ অনুবাদ করিয়াছেন।—সম্পাদক।

"From the land where there is no night
Has come One unto me.
And night and day are now nothing to me,
Ritual worship has become for ever barren.

My sleep is broken. Shall I sleep any more ?
Call it what you will—I am awake
Hush ! I have given back sleep unto Him
Whose it was.
Sleep have I put to sleep for ever.
The music has entered the instrument,
And of that mode I have learnt a song
Ah ! that music is playing ever before me,
For concentration is the great teacher thereof.
Prasad speaks—understand, O Soul,
these words of Wisdom."

(Two Saints of Kali—p. 52 Sister Nivedita)

ইহা সম্পূর্ণ গানটির অনুবাদ নয়। গানের প্রথম ও শেষ ধরা হয় নাই। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে Sister Niveditaর মত সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি।—সম্পাদক।

"William Blake, in our own poetry, strikes the note that is nearest his ? And Blake is by no means his peer. Robert Burns in his splendid indifference to rank and Whitman in his glorification of Common things, have points of kinship with him. But to such a radiant whiteheat of childlikeness, it would be impossible to find a perfect counterpart."

(Two Saints of Kali—p. 48, Sister Nivedita)

চতুর্থ পল্লব

প্রসাদী সঙ্গীত ও রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীতের তুলনামূলক বিচার

[বাঙ্গালা সাহিত্যের গীতি কবিতার ধারায় রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত ও রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীত একই শ্রেণীতে পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীত, চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের ধারার পার্শ্বে, বাঙ্গালার প্রাণে আর এক অভিনব বিচিত্র ধারা বলিয়াও পরিচয় দিতে পারে নাই। কেননা রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীত বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপ হইতে জন্মে নাই। রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীত গান নহে, ইহা যুক্তি তর্ককে ছন্দে গাঁথিয়া এক প্রকার সঙ্গীত রচনা যাহার উদ্দেশ্য ধর্ম্ম সংস্কার। ইহা রামপ্রসাদের ধর্ম্ম সাধনার তীব্র প্রতিবাদ। রামমোহন বহু গানে রামপ্রসাদকে অনুকরণ করিয়াছেন। কিন্তু কল্পকলার মাপকাঠিতে অনুকরণ, মূলের সমতুল্য হইতে পারে নাই। রামপ্রসাদ ও রামমোহনের গানের দুই চারিটির মধ্যে বাহ্য সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এই বাহ্য সাদৃশ্যে ইহাদিগকে এক শ্রেণীভুক্ত করা ভ্রম। রাম-মোহন কবি নহেন। সুতরাং তাঁহার কাব্য-সৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীতে ব্রহ্মবিরহ ব্রহ্মানুভূতি, কিছুই নাই। কেবল আছে মোহ-মুদগর জাতীয় Sermon বা ধর্ম্ম-সংস্কার। রামমোহনের গানে দ্বৈতবাদের প্রতিবাদ আছে, সেই সঙ্গে নির্গুণবাদ, অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, জন্মান্তরবাদ ও বৈরাগ্যবাদ আছে। ইহা গান নহে, ইহা যুক্তিমূলক তর্ক বা ধর্ম্ম সংস্কার।]

—সম্পাদক।

(১)

বাঙ্গালা সাহিত্যের একখানি প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থে পাঠ করিয়াছিলাম যে, "রামপ্রসাদের কণ্ঠে যে গানের অবসান হইয়াছিল তাহা পুনরায় রামমোহনের কণ্ঠে উত্থিত হইয়া নব্য সমাজকে মাতাইয়া তুলিল", এবং "যে বৎসরে রামপ্রসাদের মৃত্যু হয় সেই বৎসরের শেষ ভাগে রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন।" (১)

রামপ্রসাদের মৃত্যুর বৎসরে রামমোহন যদি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন তবে তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই। যদিও রামপ্রসাদের মৃত্যুর বৎসর ও রামমোহনের জন্মের বৎসর সকলের মতে একই বৎসর বলিয়া স্থিরীকৃত হয় নাই। মত বিভিন্নতা আছে। (২) কিন্তু আমার দুঃসাহস এই যে, আমি

১। "যে বৎসর রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়, সেই বৎসরের শেষ ভাগে রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। রামপ্রসাদের কণ্ঠে যে গানের অবসান হইয়াছিল, তাহা পুনরায় রামমোহনের কণ্ঠে উত্থিত হইয়া নব্য সমাজকে মাতাইয়া তুলিল।"

[বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৬২৩
ডাঃ দীনেশ সেন।]

২। "ঠিক যে বৎসর রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়, সেই বৎসরই রাম-মোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন।"

[বগুড়া অভিভাষণ, ১৯১৭]

রামমোহনের জন্ম বৎসর ১৭৭২ খৃঃ এবং ১৭৭৪ খৃঃ বলিয়া মতান্তর আছে। সুতরাং কোন বৎসরে যে রামপ্রসাদের মৃত্যু হইয়াছিল—তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।—সম্পাদক।

বলিয়াছিলাম (১), আবার আজো বলি যে, "রামপ্রসাদ যে সুরে গাহিয়া গেলেন—রামমোহন ঠিক তার উল্টা সুর ধরিলেন।" আমি যাহা বলিয়াছিলাম, আবার আজ তাহাই ভাল করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব। বাঙ্গালা সাহিত্যের উক্ত ইতিহাসে রামপ্রসাদকে বৈষ্ণব-বিদ্বেষী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। (২) আমি মনে করি বাঙ্গালা সাহিত্যের আর একখানি ইতিহাস লিখিবার প্রয়োজন। যাহাতে লেখা থাকিবে রামপ্রসাদ বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন না। বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন রামমোহন। রামমোহনের বহু রচনা হইতে এই বৈষ্ণব-বিদ্বেষের প্রমাণ উদ্ধার করা কিছুই কঠিন কার্য্য নয়। (৩) রামমোহনের বৈষ্ণব বিদ্বেষের পরিচয় দেওয়া আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বাঙ্গালার গীতি কবিতার ধারায় রামপ্রসাদের "শ্যামা সঙ্গীতের" পর রামমোহনের "ব্রহ্ম সঙ্গীতের" যৎসামান্য আলোচনাই আমার উদ্দেশ্য। এই আলোচনা করিতে গিয়া আমি সম্প্রতি প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত দুই একটি মতের প্রতিবাদ করিয়াছি। সাধারণ ভাবে আমার

১। "রামপ্রসাদ যে সুরে গাহিয়া গেলেন, রামমোহন ঠিক তার উল্টা সুর ধরিলেন।" [বগুড়া অভিভাষণ, ১৯১৭]

২। "রামপ্রসাদ বৈষ্ণববিদ্বেষী ছিলেন।"

[বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৫৯৪
ডাঃ দীনেশ সেন]

৩। রামমোহনের বৈষ্ণব-বিদ্বেষের কথা তাঁহার রচিত পুস্তকাদির মধ্যে অনেক পাওয়া যায় * * * । [বগুড়া অভিভাষণ, ১৯১৭]

বলিবার কথা এই, বাঙ্গালা সাহিত্যের গীতি কবিতার ধারায় রামমোহনের "ব্রহ্মসঙ্গীত" ও রামপ্রসাদের 'শ্যামাসঙ্গীত" একই-শ্রেণীতে পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। অর্থাৎ একথা আমি স্বীকার করি না যে, রামপ্রসাদের কণ্ঠে যে গানের অবসান হইয়াছিল, রামমোহনের কণ্ঠে সেই গানই উত্থিত হইয়াছিল। কল্পকলার রাজ্যে যদি জাতিভেদ কল্পনা করা যায়, তবে রামপ্রসাদের গান আর রামমোহনের গান এক জাতির অন্তর্ভুক্ত কখনই হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে আমি আরও বলিয়াছিলাম যে, রামপ্রসাদের গান বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপ হইতে জন্মিয়াছে। কিন্তু রামমোহনের গানের যে ঢং, যে ভাব, যে দ্যোতনা—তাহা বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপ হইতে জন্মে নাই। এবং বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপের সহিত যে কবির পরিচয় আছে, সে কবি কখনই এমন গান বাঁধিতে পারে না। ইহাতে যে সকল প্রভাবের আরোপ আছে, সে প্রভাব বাঙ্গালার প্রাণের সহিত মিশ খায় নাই। কাজেই রামমোহনের গান কোন গান হয় নাই। কল্পকলার কোন রূপান্তর তাঁহার গানের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। এবং আমার বিশ্বাস বাঙ্গালার প্রাণের সহিত রামমোহনের পরিচয় ছিল না। কেন না, তাঁহার কল্পকলায়, তাঁহার গানে বাঙ্গালার প্রাণের কোন পরিচয় মিলে না। (৪) ;

৪। "রামমোহন প্রতিভাশালী মহাপুরুষ হইলেও বাঙ্গালার প্রাণের

বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপ হইতে যে বিচিত্ররূপ ও সুরের দোল উঠিয়াছে—তাহা চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের কল্পকলার রূপান্তরে আপনারা দেখিয়াছেন। (৫) এমন কথা আমি বলি না যে, চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের যে বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপের প্রকাশ - তাহাই একমাত্র বৈশিষ্ট্য। আমার বাঙ্গালাব প্রাণের অনন্তরূপ—অফুরন্ত বৈচিত্র্য। সুতরাং রামমোহনের "ব্রহ্মসঙ্গীত" চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের ধারা-বৈচিত্র্যের পার্শ্বে বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপের আর এক বিচিত্ররূপ

সহিত তাহার পরিচয় ছিল না * * * রামমোহনের গান, গান নহে, জোর করিয়া মানুষকে বেদান্তের ঔষধ গেলান।"

[বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭]

৫। (ক) "চণ্ডীদাসের গানে, রামপ্রসাদের গানে যে, রূপান্তরের পরিচয় পাওয়া যায়, আধুনিক কবিদিগের কবিতার মধ্যে তাহা পাওয়া যায় না।"

[বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭]

—(খ) "এই রূপান্তর চণ্ডীদাসের জীবনে হইয়াছিল, যখন তিনি তিমির অন্ধকার পার হইয়া সহজকে জানিলেন, যখন প্রাণের অনুভূতির কষ্টি পাথরে 'বিষামৃতের' একত্রে মিলন রেখা, মরমের দাগে সোনার নিকষের মত দাগ দিয়া রূপান্তর মহাপ্রভুর জীবনে হইয়াছিল, যখন সব ঠাঁইয়ে তাঁহার কৃষ্ণ-স্ফূরণ হইতে লাগিল।

এই রূপান্তর রামপ্রসাদের হইয়াছিল, যখন তিনি সত্য জগন্মাতাকে রূপের লীলায় প্রত্যক্ষ দেখিতেন, অবোধ বালকের মত মায়ের নিকট আব্দার করিতেন, কখনও বা তাঁহাকে গালি দিতেন। এই রূপান্তর শ্রীরামকৃষ্ণেও ফুটিয়াছিল। রামপ্রসাদের সাধনা রামকৃষ্ণের ভিতর যেন জীবন্ত রসমূর্ত্তিতে মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল।"

(বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭)

বলিয়া যদি এ যুগে আত্মপরিচয় দিতে পারিত তবে তাহাতে কোনই বাধা ছিল না। কিন্তু রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীত তাহা পারে নাই। চণ্ডীদাসের সৃষ্টি আর রামপ্রসাদের সৃষ্টি বিচিত্র। কিন্তু বিচিত্র হইলে ত তাহারা মূলে বিচ্ছিন্ন নয়। রামমোহনের গানে যে স্বাতন্ত্র্য, যে পার্থক্য আমরা সহজেই লক্ষ্য করিয়া থাকি—সে স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য বিচ্ছেদের। রামমোহনের গানের মূল খুঁজিতে গেলে দেখা যায় যে, ইহা বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপ হইতে জন্মে নাই। সেইজন্য একদিকে যেমন প্রসাদী সঙ্গীতের সহিত এই ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রহ্ম-সঙ্গীতের কোনও সম্পর্ক নাই, তেমনই অন্যদিকে ইহা বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপের কোনও নূতন রূপ বা সুরের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ইহা ছাড়া কল্পকলার দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, যাহাকে গান বলে, যাহাকে ,কাব্যের রূপান্তর (১) বলে, ব্রহ্মসঙ্গীতে তাহার কিছুই নাই। কল্পকলার দিক দিয়াই কাব্যের বা গানের বিচার। সে বিচারে রাম-মোহনের ব্রহ্মসঙ্গীতের মূল্য কি আমরা তাহারই নিরূপণের চেষ্টা করিব।

১। (ক) "আমার এই প্রাণ যখন জাগরিত হইয়া মহাপ্রাণের আলোকে নিজেকে জ্যোতিষ্মান্ করিয়া তুলে, সেই মুহূর্ত্তেই আমার নিজের সত্য পরিচয় লাভ হয়। সেই কথাই রূপান্তরের কথা,—ইহাই প্রকৃত কবিতার কথা।" [বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭]

(খ) "কিন্তু রামমোহনের গান, গান নহে। জোর করিয়া মানুষকে বেদান্তের ঔষধ গেলান। [বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭]

প্রথম আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, প্রসাদী সঙ্গীতের সহিত এক শ্রেণীতে "ব্রহ্মসঙ্গীতকে" পর্য্যবসিত করিবার কি হেতু ছিল।

আপনারা দেখিয়াছেন, প্রসাদী সঙ্গীত একটা সাধক জীবনের ক্রম অভিব্যক্তির ইতিহাস। সাধনার শেষ অবস্থায় রামপ্রসাদ সিদ্ধ হইয়াছিলেন—ইহাই সাধনার রূপান্তর। এই অবস্থায় রামপ্রসাদ তীর্থ পর্য্যটন, বাহ্য পূজানুষ্ঠান, নৈবেদ্য ও ছাগ মহিষ বলিদান, কোন বিশেষ স্থানে বা কালে, কোন বিশেষ ধাতু পাষাণ মাটী মূর্ত্তির সম্মুখে কোন বিশেষ আচার এমন কি কোন নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহার অভীষ্ট দেবীকে পূজা করিবার কোন আবশ্যক বোধ করেন নাই। (২)

(২) এই সম্পর্কে রামপ্রসাদের সমগ্র গানটি এইরূপ—

মন তোর এত ভাবনা কেনে?
একবার কালী বলে বসরে ধ্যানে।
জাঁক জমকে করলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তারে করবে পূজা জানবে নাকো জগজ্জনে॥
ধাতু পাষাণ মাটীর মূর্ত্তি—কাজ কিরে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি বসাও হৃদি পদ্মাসনে॥
আলো চাল আর পাকা কলা কাজ কিবে তোর সে আয়োজনে।
তুমি ভক্তি সুধা খাইয়ে তারে তৃপ্ত কর আপন মনে॥
ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো কাজ কিরে তোর সে রোসনাইয়ে।
তুমি মণিময় মাণিক্য-জেলে দেওনা জলুষ নিশি দিনে॥
মেষ ছাগল মহিষাদি কাজ কিরে তোর বলিদানে।
তুমি 'জয়কালী জয়কালী' বলে বলি দেও ষড় রিপুগণে॥
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল কাজ কিরে তোর সে বাজনে।
তুমি 'জয়কালী' বলে দেও করতালি, মন রাখ সেই শ্রীচরণে॥

এই বিখ্যাত গীতটির ইংরাজী অনুবাদ :—

THE FOOLISHNESS OF SACRIFICES.

Wherefore so anxious, Mind ? Let Kali's name
be said.
In meditation sit you too.
From all this pomp of worship pride is bred :
Worship in secret, you.
What is your gain from metal shapen, earth,
or stone ?
Her image make—no art—
Of stuff of mind : on your heart's lotus-throne
Set it for aye apart.
Parched rice and plantains—to offer them how weak
To satisfy your mind !
Feed her with nectar of devotion. Wherefore seek
With lamp, you blind,
Aad lantern, candle, to illumine her ? Oh, light
Mind's jewelled lamp :
Let it its lustre flash both day and night.
Wherefore this earthly tramp
Of sheep, goats, buffaloes brought for sacrifice ?
These words repeat
"Victory to Kali" : offer the sixfold vice.
Why tomtoms, drums to beat ?
Clap hands ; sing "Victory" ; and lay mind
at her Feet.

[**Religious Lyrics of Bengal,** J A. Chapman ; Published, 1926—by Girindra Nath Mittra, Book Co., College Square & Printed by S. C. Majumdar, Sri Gouranga Press, Calcutta. Selected and translated by Edward J Thompson and Arthur Marshman Spencer]

কেন না যে সিদ্ধির জন্য উহার প্রয়োজন সে সিদ্ধি এখন তাঁহার করতলগত হইয়াছিল। সেই সিদ্ধ অবস্থায় তাঁহার গানে ও কল্পকলায় যে অভিনব রূপান্তর ঘটিয়াছে—তাহা তাঁহার তৎকালীন সিদ্ধ অবস্থারই অনুরূপ। কলাবিৎ ও সাধক তখন এক হইয়া মিশিয়া গিয়া নিজেকে যে স্বাভাবিক পরিণতিতে লইয়া গিয়াছেন—এই সৃষ্টি হইতেছে সেই পরিণতি। ইহা লৌকিক ধর্ম্ম-সংস্কারের প্রতি কোন কটাক্ষও নহে—ইহা মূর্ত্তিপূজার বিরোধী কোন মতবাদও নহে—ইহা কোনওরূপ সমাজ বা ধর্ম্মসংস্কারও নহে। ইহা কলাবিদের স্বাভাবিক সৃষ্টি। যাহাকে আমি আইডিয়েলিজম (Idealism)

রামপ্রসাদের—এই গানের ভাবে অনুপ্রাণিত রামমোহনের একটি গান এইরূপ—

অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান করে।
ইহ তিষ্ঠ বল তারে এ কি অবিচার॥
এ কি দেখি অসম্ভব বিবিধ নৈবেদ্য সব
তাঁরে দিয়া কর স্তব এ বিশ্ব যাঁহার॥

ইহা প্রত্যক্ষ যে রামমোহনের গানে যুক্তিই প্রধান।

এ কি দেখি অসম্ভব বিবিধ নৈবেদ্য সব
তাঁরে দিয়া কর স্তব এ বিশ্ব যাঁহার।

রামমোহন অবিকল এই ভাবটি রামপ্রসাদ হইতে লইয়াছেন। রামপ্রসাদ গাইলেন—

জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা।
তাঁকে তুমি খাওয়াতে চাও—আলো চাল আর বুট ভিজানা॥

রামপ্রসাদে গান—আর রামপ্রসাদ-অনুকরণকারী রামমোহনে গান নয়—কেবল যুক্তি, তর্ক। ইহাই চিত্তরঞ্জনের বলিবার কথা।

—সম্পাদক।

বা রিয়েলিজম (Realism) কিছুই বলি না। যাহাকে আমি নেচারেলিজম (Naturalism) বলিয়া কতকটা বলিয়া আসিতেছি। (১)

রাজা রামমোহন একজন ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক।

১। (ক) ১৮৯০-৯৪ সনে চিত্তরঞ্জন লণ্ডনে ছিলেন। Carveth Read তাঁহার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ২২ বৎসরের যুবক চিত্তরঞ্জনকে Idealism and Realism in Arts সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতে বলেন। ঐ বিষয় সম্বন্ধে তখন Edmund Gosseএর একখানি নূতন বই বাহির হয়। চিত্তরঞ্জন তাঁহার অধ্যাপকের নিকট প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্বে ঐ গ্রন্থখানি একবার পড়িবার অনুমতি চাহেন। অধ্যাপক তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া বলেন, "No my boy, never do that. Think on the subject. I give you seven days' time", এই কথার পর ৭ দিনের পরিশ্রমে তিনি ঐ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, অধ্যাপক তাহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত খুসী হইলেন এবং বলিলেন যে Edmund Gosse-এর অনেক ভাবধারা এই প্রবন্ধে রহিয়াছে।

[দেশবন্ধু স্মৃতি পৃঃ ৭৫
—হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত]

(খ) "Realism ও Idealism লইয়া যে তর্কবিতর্ক চলিত, ইহা কতকটা সেই প্রকারের তর্ক। ইংরাজী সাহিত্যে ইহার একটা মোটামুটী রকমের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। এই মীমাংসা ওয়ার্ডসওয়ার্থের Skylark-এর শেষ দুইটি ছত্রে আছে।

Type of the wise who soar but never roam
True to the kindred points of Heaven and Home!

অর্থাৎ সংসার ও পরমার্থ, প্রত্যক্ষরাজ্য ও ভাবরাজ্য—এই দু'য়ের প্রতিই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।"

(মুন্সিগঞ্জ অভিভাষণ—১৯১৪)

(গ) "এই কবিতাগুলি Realistice নয়, Idealistice নয়;

আমি যে মহামিলন-মন্দিরের কথা বলিয়াছি তাহারি ধ্বনি। এগুলি জীবনের কবিতা, ইহাতে জীবনের ধ্বনি পাওয়া যায়।"

(মুন্সিগঞ্জ অভিভাষণ ১৯১৪)

(ঘ) "শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্ Idealistও নয়, Realistও নয়। সে Naturalist, শুধু ভাব লইয়াও সে স্বপ্নের দেশে ফুল ফুটায় না, শুধু দেহের রস-রক্তের সন্ধানেই কাটায় না।"

(বাঁকিপুর অভিভাষণ ১৯১৬)

(ঙ) "বর্ত্তমান জীবনের ধারাকে স্বাভাবিক করিতে হইবে—চণ্ডীদাসের গানের মত স্বাভাবিক। রামপ্রসাদের গানের মত আমাদের সেই স্বাভাবিকতায় ফিরাইয়া লওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। বাঙ্গালার স্বাভাবিকতা ফরাসী রুশোর Naturalism নহে। এ স্বাভাবিকতায় প্রকৃতি ও আত্মা আত্মস্থ, প্রকৃতির দাস নহে।"

(বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭)

(চ) "শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করুন দেখিবেন আজ ইংরাজী পড়িয়া যে Realism Idealism লইয়া এত মাতামাতি করিতেছেন, তাহার পরিপূর্ণ অনুভূতি ও কল্পকলার প্রতিষ্ঠা তাহাতে হইয়াছে কি না। শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্য খণ্ড ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জগাই-মাধাই উদ্ধার বর্ণনা পড়িলে বুঝিতে পারিবেন। ইহাতে বৈষ্ণব পদাবলীর সে রস চিত্রের ও সুরের খেলা নাই, কিন্তু যাহা আছে, তাহা Ideal কি Real তাহার বিচার করিতে পারেন কি ?

নিত্যানন্দ অঙ্গ সব রক্তে পড়ে ধারে।
হাসে নিত্যানন্দ সেই দুইয়ের ভিতরে॥

* * *

মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এ দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির॥

এই যে চরিত চিত্র, ইহাকে আপনারা কি বলিবেন ? Realism না Idealism এর কল্পকলা ? আমি বলিব এই যে অভিনব রূপ চরিত্র সৃষ্টি, ইহা বাঙ্গালায়ই সম্ভব, কেননা ইহা বাঙ্গালায় ঘটিয়াছিল, এবং ইহা বাস্তব সত্য।" (বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭)

তাঁহার ব্রহ্ম-সমাজের ট্রাষ্টডীডের একস্থানে আছে যে, পরমেশ্বরের কোন প্রচলিত নাম জপ বা রূপ ধ্যান লইয়া ব্রহ্ম উপাসনা বা সঙ্গীত চলিতে পারিবে না। (১) এই উপাসক মণ্ডলীর মধ্যে সুতরাং চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের সঙ্গীতের কোনই স্থান নাই। রামমোহনপন্থী উপাসকমণ্ডলী চণ্ডীদাস ও

১। (ক) "For the worship and adoration of the Eternal Unsearchable and Immutable Being * but not under or by any other name designation or title peculiarly used for and applied to any particular Being or Beings by any man or set of men whatsoever and that no graven image statue or sculpture carving painting picture portrait or the likeness shall be admitted within the said messuages building etc * * that no sacrifice, offering or oblation of any kind or thing shall ever be permitted therein etc * *

(The Trust Deed of the Brahmo Samaj 1830, 8th January)

(খ) রামমোহন শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে মূর্ত্তি পূজাকে ব্রহ্মের গৌণ উপাসনা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মুখ্য উপাসনা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। নামরূপে ব্রহ্মের আরোপ করিতে পার; কিন্তু ব্রহ্মে নামরূপের আরোপ হইতে পারে না। প্রতিমাদিতে মনস্থিরের জন্য সাধক প্রথম অবস্থায় পূজাদি করিতে পারেন—এমন কথাও রামমোহন অনেক স্থানে বলিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে ঐ সকল স্থান উদ্ধৃত করা হইল না। যাঁহার ইচ্ছা হয় রামমোহন রচিত ব্রাহ্মণ সেবধি, গোস্বামী এবং ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার প্রভৃতি পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন।—সম্পাদক।

রামপ্রসাদের গীতিধারা হইতে এইরূপে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিলেন। বলা বাহুল্য, বৈষ্ণব ও শাক্তের সাধনধারা হইতেও তাঁহারা আত্মরক্ষা (?) করিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লেখক যাহাকে নব্য সমাজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই নব্য রামমোহনী সমাজের জন্য, রামমোহন যেমন প্রচলিত শাক্ত ও বৈষ্ণবের সাধন ছাড়িয়া নামরূপবিহীন, নিরাকার, নির্গুণ ব্রহ্ম সাধনার ব্যবস্থা করিলেন তেমনই ঐ "নব্য" সমাজের জন্য তিনি এক শ্রেণীর ব্রহ্মসঙ্গীতও রচনা করিলেন। এই ব্রহ্মসঙ্গীতের উদ্দেশ্য ধর্ম্মসংস্কার। কলাবিৎ বা কবির কাব্য সৃষ্টি নহে।

রামমোহন মূর্ত্তি-বিদ্বেষী ধর্ম্মসংস্কারক। তিনি ব্রহ্মের কোন বিশেষ পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার প্রচলিত ব্রহ্মসঙ্গীতও ভগবানের নামরূপকে পরিত্যাগ করিল। নামরূপ লইয়া রামপ্রসাদ যে সাধনা ও কাব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন—ইহা সে সাধনাও নহে, সে কাব্যসৃষ্টিও নহে। রামপ্রসাদের সিদ্ধ অবস্থায় যখন রামপ্রসাদ রটনা করিতেছেন, প্রত্যক্ষ করিতেছেন, যে "মা বিরাজে সর্ব্বঘটে", যখন "যত শুনি কর্ণপুটে সবই মায়ের মন্ত্র বটে"—যখন আহার করিতে করিতে মনে হয় "আহুতি দেই শ্যামা মারে," যখন নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—জীব মরিয়া শিব হইয়াছে,—যখন ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এক অনির্ব্বচনীয় অনন্ত মুহূর্ত্তে (২) আসিয়া এক সঙ্গে দেখা

২। (ক) যে সমস্ত দিন আলস্যে অতিবাহিত করে, সেও একবারে

দিয়াছে—এবং জন্ম জন্মান্তরের যবনিকা অপসারিত হইয়া যাওয়ার পর রামপ্রসাদ বলিতেছেন—

"ইহ জন্ম পর জন্ম বহুজন্ম পরে
রামপ্রসাদ বলে আমার জন্ম হবে না জঠরে"

—যখন তিনি বলিতেছেন "ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই যুগে যুগে জেগে আছি"। সেই অবস্থায় কাব্যের রূপান্তরে যখন এক সৃষ্টির পর আর এক সৃষ্টি আসিয়া দেখা দিল তখনকার অবস্থায় বাহ্যিক পূজানুষ্ঠান ও তীর্থ পর্য্যটনাদির অনাবশ্যকতা সম্বন্ধে যে সমস্ত গান রচিত হইয়াছিল সেই সমস্ত গানকে সাধক জীবন ও কলাবিদের জীবন হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া রামমোহনের মূর্ত্তি বিদ্বেষী কতকগুলি গানের সহিত তুলনা করিয়া যে সাদৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা তাহা তুলনামূলক বিচার পদ্ধতিকে অবমাননা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তুলনীয়

অসাড় না হইলে মাঝে মাঝে দূরাগত বংশীধ্বনি শুনিতে পায়, আর সেই বংশী রবে সে আর একটা রাজ্যে গিয়া উপনীত হয়। এই সব মুহূর্ত্তগুলি জীবনের "অনন্ত মুহূর্ত্ত।" এই মুহূর্ত্তেই আমরা প্রকৃত জীবনযাপন করি এবং আমাদের ও অপরের প্রতিদিনের জীবনযাপনের সার্থকতা বুঝিতে পারি।" * *

* * আমরা সকলেই সেই অন্ত প্রকৃতির—সেই প্রাণের খোঁজে ব্যস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াই। যাহাকে জীবনের "অনন্ত মুহূর্ত্ত" বলিলাম সেই অনন্ত মুহূর্ত্তে সেই প্রাণেরই সাক্ষাৎলাভ হয়। আর সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের হৃদয় মন রসোচ্ছাসে অধীর হইয়া পড়ে। তখন কবিতার সৃষ্টি হয়।"

(মুন্সিগঞ্জ অভিভাষণ ১৯১৪)

বস্তু সম অবস্থার হওয়া চাই। রামপ্রসাদের সিদ্ধ অবস্থার গানের পশ্চাতে যে একটী নামজপ, রূপধ্যান ও জবা বিল্বদলে

(খ) "শিল্পের সাধনা করিতে করিতে, রূপ হইতে রূপে বিলাস করিতে করিতে, জীবনে এমন এক মুহূর্ত্ত আসে, সেই 'অনন্ত মুহূর্ত্তে' এই রূপরাগভরা শব্দ স্পর্শ গন্ধময়ী পৃথিবীর রূপের মাঝে আসল রূপ ঝলসিয়া উঠে। যাঁহাকে চাই, তাঁহারই সাক্ষাৎকার হয়। সেই শুভ মুহূর্ত্তের জন্যই সকল কল্পকলাবিদের সাধন। সেই শুভ মুহূর্ত্তেই সকল সৃষ্টি সুন্দর, মধুর, কল্যাণ ও মঙ্গল হইয়া উঠে।"

(বাঁকিপুর অভিভাষণ ১৯১৬)

(গ) "একটি নারী মূর্ত্তি দেখিয়াই প্রথম প্রেমের উন্মেষ হয়। * * যতই আমরা প্রাণের সাক্ষাৎ পাই, ততই সে মৃন্ময়ীমূর্ত্তি চিন্ময়ী হইয়া উঠে। * * অনুরাগ গাঢ় হইলে—তখন স্পষ্ট দেখিতে পাই, যেই শুভক্ষণে তাহাকে প্রথম দেখিয়াছিলাম সে যে আমার মাহেন্দ্রক্ষণ। সেই মুহূর্ত্তই যে আমার জীবনের 'অনন্ত মূহর্ত্ত!' আমি আমার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। তাঁহারও সাক্ষাৎ পাইয়াছি।

(রূপান্তরের কথা ১৯১৭)

"অনন্ত মুহূর্ত্ত" সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনের একটা সুস্পষ্ট ধারণা আছে। ইহা দেখা গেল। Irelandএ যেরূপ Celtic movement দেখা দিয়াছিল,—চিত্তরঞ্জনের "বাংলার প্রাণ" আন্দোলনকেও সাহিত্যে তদনুরূপ একটী আন্দোলন বলিয়া অনেকে অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ নামাঙ্কিত পণ্ডিচারী হইতেও চিত্তরঞ্জন সম্পর্কে এরূপ সমালোচনা আমরা পাইয়াছি। কেলটিক আন্দোলনের মধ্যে যে একটি Mystic ভাব আছে তা সকলেই জানেন। চিত্তরঞ্জনের মধ্যেও অতি আশ্চর্য্য রকমের একটা Mystic ভাব ছিল—ইহা আমরা তাঁহার উপরে উদ্ধৃত কথা হইতে প্রত্যক্ষ করিতেছি। তিনি শুধু একজন সুকবি ছিলেন বলিয়াই যে Mystic ছিলেন তা নয়। তিনি স্বভাবতঃই Mystic ছিলেন। পণ্ডিচারীর সমালোচনা ইহাকে "সমুদ্রের রহস্যের প্রতি টান" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া চিত্তরঞ্জন হাস্য করিয়াছিলেন।—সম্পাদক।

মূর্ত্তি পূজার দীর্ঘ সাধনা বিদ্যমান,—রামমোহনের সাধন ধারার প্রবেশ পথের প্রথমেই রামপ্রসাদীয় সাধন পদ্ধতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিষেধ। এই উদ্দেশ্যমূলক ধর্ম্ম সংস্কার প্রসূত। কাজেই কল্পনার রূপান্তর ঘটিবার অবকাশ ইহাতে কম এবং বস্তুতঃ রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীতে কল্পকলার কোন রূপান্তর ঘটে নাই।

রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীত কবির কাব্য সৃষ্টি নয়। কলাবিদের কল্পকলার সৃষ্টিও নয়। ইহা যুক্তি তর্ককে, বুদ্ধি বিচারকে ছন্দে গাঁথিয়া এমন এক প্রকার সঙ্গীতের রচনা—যাহার উদ্দেশ্য ধর্ম্মসংস্কার। বলা বাহুল্য ইহা রামপ্রসাদের ধর্ম্ম সাধনার তীব্র প্রতিবাদ, রামপ্রসাদের ধর্ম্মসাধনার প্রতি বিদ্বেষ ও তাহার ভ্রম প্রদর্শন।

ধর্ম্ম সংস্কার একটি মহৎ কার্য্য। আমরা রামমোহন প্রদর্শিত রামপ্রসাদের ধর্ম্ম সংস্কারের বিচার এ প্রবন্ধে করিব না। আমরা এই দুইজন সঙ্গীত রচয়িতার কাব্য সৃষ্টি লইয়া তুলনা করিব।

আমরা দেখিতেছি রামপ্রসাদের সঙ্গীত কল্পকলার স্বাভাবিক পরিণতি। আর রামমোহনের সঙ্গীত ছন্দে বদ্ধ ধর্ম্ম সংস্কার, রামপ্রসাদের সাধনার প্রতিবাদ—কিন্তু কোন কাব্য সৃষ্টি নয়। অথচ এই দুই বস্তু কি করিয়া এক হইতে পারে, এবং ততোঽধিক বিস্ময়ের কথা যে এক শ্রেণীর এক অবস্থার এক স্তরের কল্পকলায় যাহা পরিগণিত হইতে পারে

না—তাহা কি করিয়া সমশ্রেণীর বলিয়া সাহিত্যের প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থে অবিচারে স্থান পাইতেছে ?

যে সাধনা, যে রূপ ও সুর রামপ্রসাদের কণ্ঠে অবসান হইতে না হইতে—রামমোহনের কণ্ঠে সেই সাধনার সেই সুর ও রূপের প্রতিবাদধ্বনিরূপে উত্থিত হইল—তাহা কল্পকলার রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধির বিচারেও দুইটি পরস্পরবিরোধী সুর বলিয়াই বিবেচিত হইবার যোগ্য। বাহিরের তথাকথিত সাদৃশ্য দেখিয়া কি বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন ?

রামপ্রসাদ সাধনের এক অবস্থায় গাহিয়াছেন—

মন, তোমার এ ভ্রম গেল না
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি
জেনেও কি তা জান না ?

তারপর, "ধাতু পাষাণ মাটী মূর্ত্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে ?" এই সমস্ত সঙ্গীতগুলির সহিত রামমোহনের কতকগুলি সঙ্গীতের যে তুলনা করা হইয়াছে—তাহা এক বস্তু নয়। রামমোহন, সাধক রামপ্রসাদের সিদ্ধ অবস্থার গানগুলির ভাব লইয়া—রামপ্রসাদের সাধন নাম জপ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া যে সঙ্গীত রচনার প্রয়াস করিয়াছেন—তাহাতে কোন রূপ ফুটে নাই—কোন সুরের দোল উঠে নাই। তাহা সৃষ্টি হয় নাই।

রামপ্রসাদের সমশ্রেণীর সৃষ্টি ত দূরের কথা। যেমন রামমোহন গাহিলেন—

মন একি ভ্রান্তি তোমার
আহ্বান বিসর্জ্জন বল কর কার,
যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে ইহা গচ্ছ বল তাকে
তুমি কেবা আন কা'কে একি চমৎকার।

এই গানটি রামপ্রসাদকে অনুকরণ করিয়া রচিত। (১)

১। রামমোহন রামপ্রসাদকে অনুকরণ করিয়াছেন নিম্নলিখিত গানগুলিতে—

ক। অজপা হইলে রোধ, তবে জন্মে তার বোধ,
গুঞ্জে মত্ত মধুব্রত স্বরে।"—রামপ্রসাদ।

* * * *

খ। অজপা হতেছে শেষ, বাড়িল আশা অশেষ,
নির্গুণ বিশেষ বোঝ না।"—রামমোহন।

* * * *

গ। "অজপা হতেছে শেষ, ত্যজ দম্ভ রাগ দ্বেষ,
যাবে ক্লেশ নির্ব্বিশেষ, কর রে সূচনা।"
—রামমোহন।

* * * ০

ক। "অদ্য অব্দে শতান্তে বা 'অবশ্য' মরিতে হবে"
—রামপ্রসাদ।

* * *

গ। "কিন্তু দেখ মনে ভেবে, কেহ নাহি সঙ্গে যাবে,
'অবশ্য' তেজিতে হবে কিছু দিনান্তর"—রামমোহন ;

* * *

বৈরাগ্যসূচক রামপ্রসাদের আরও কয়েকটি গানের প্রতিধ্বনি রামমোহনের ব্রহ্ম-সঙ্গীতে শুনা যায়।—সম্পাদক।

অথচ কলাসৃষ্টির দিক হইতে রামপ্রসাদের গানের সহিত ইহার বিচারও হইতে পারে না, আমরাও সে ব্যর্থ প্রয়াসে প্রবৃত্ত হইতে চাহি না। তবে শুধু যে বাহ্যিক সাদৃশ্য কল্পনা মাত্র করিয়া রামপ্রসাদ ও রামমোহনের কতকগুলি সঙ্গীত নিতান্ত ভ্রমবশতঃ এক শ্রেণীর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে—সেই সাদৃশ্যও যে সাদৃশ্য নহে আমি বাহির হইতেই তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। রামপ্রসাদের কল্পকলার ইঙ্গিত এইরূপ যে—আমার মায়ের মূর্ত্তি শুধু ঐ ধাতু পাষাণ বা মাটীতেই আবদ্ধ নহে—তিনি দেখিলেন এবং গাহিলেন "ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি"—ইহা অনুভূতির পরেও সাক্ষাৎ দর্শন। (১) রামপ্রসাদের এই সাক্ষাৎ দর্শনের পরিচয় আমরা পাই। রামমোহন গাহিলেন "যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে ইহা

১। "সাধক মায়ের আবির্ভাব অনুভব করিতেছেন। আপনারা বোধ হয় মায়ের এই আবির্ভাব পর্য্যন্তই স্বীকার করিবেন। কিন্তু আমি বলিব সাধকের নিকট মা সাক্ষাৎ মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া দেখা দেন। এ কথা লইয়া তর্ক বৃথা। ইহা লইয়া কেহ তর্ক করে না। আমিও করিব না।"

দ্বিতীয় পল্লব—(বর্ত্তমান প্রবন্ধ)

এখানেও আমরা চিত্তরঞ্জনকে Mystic রূপেই দেখিতে পাই। "তনয়া রূপেতে বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া",—চিত্তরঞ্জন ইহা পুরাপুরি বিশ্বাস করিতেছেন। কিন্তু একথা লইয়া তাঁহার তর্কে স্পৃহা নাই—ইহাও বলিতেছেন। সম্ভবতঃ ইহা তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাসের কথা। সুতরাং তাঁহার বিশ্বাস মতো ইহা তর্কের উর্দ্ধে। "আপন ভজন কথা, না কহিও যথা তথা।" এই নীতিই এখানে তিনি অনুসরণ করিয়াছেন।—সম্পাদক।

গচ্ছ বল তাকে।" ইহার ইঙ্গিত এইরূপ—যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে তাকে ইহা গচ্ছ বলিলে অযুক্তির কাজ হয়। যুক্তি বিচারে যাহা অসিদ্ধ তাহা করিবে কেন? যুক্তি ত বিচারপূর্ব্বক ধর্ম্ম সংস্কার। কিন্তু ইহা ত কলাবিদের সৃষ্টি নয়।

রামমোহন রামপ্রসাদের ভাব লইলেন—কিন্তু মায়ের মূর্ত্তি এই কথাটিতে তাঁহার কেমন আটকাইয়া গেল। তিনি মায়ের মূর্ত্তির বিরোধী। তা সে মূর্ত্তি ধাতু পাষাণেই হউক, আর সাধনের পরিণতিতে সাধকের চক্ষে ত্রিভুবন ব্যাপিয়াই হউক। রামপ্রসাদের এই মূর্ত্তি সাধনাও এমন কি তাঁহার এই ত্রিভুবন-ব্যাপী স্বাভাবিক পরিণতিরও বিরুদ্ধে রামমোহনের ধর্ম্ম সংস্কার। কেন না তাঁহার যুক্তি বলিয়াছে—

১। 'বিভু' নামরূপহীন নিস্ত্রৈগুণ্য—অথচ

২। তিনি সর্ব্বত্র থাকেন

৩। সুতরাং কোন বিশেষ স্থানে ইহ। গচ্ছ বলিয়া ডাকা অযুক্তির কার্য্য। এবং এই বিভু যদি মায়ের মূর্ত্তি হইয়া ত্রিভুবন আচ্ছন্ন করিয়া আসিয়া দেখা দেন তবে তাহাও যুক্তিতঃ অগ্রাহ্য।

সাধনার বৈপরীত্যে এই বিপরীত রীতির প্রচলনের চেষ্টা বাঙ্গালী রামমোহন করিয়াছিলেন। আমি এইরূপই বুঝিয়াছি—তাই বলিয়াছিলাম "রামপ্রসাদ যে সুরে গাহিয়া গেলেন—রামমোহন ঠিক তাহার উল্টা সুর ধরিলেন।"

রামপ্রসাদের কল্পকলার পরিণতিতে দেখা যাইতেছে—

ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি—ইহা অনুভূতির বস্তু—ইহা সাক্ষাৎ দর্শন। রামমোহনে এই অনুভূতি ও দর্শন কেহ আশা করিবেন না। কেন না তিনি রামপ্রসাদের সাধন পথকে কুসংস্কার জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং যে সাধন পথ তিনি পরিত্যাগ করিলেন, সে সাধনপথের কোন খবর—সিদ্ধি ত দূরের কথা—তাঁহার নিকট উন্মাদ ব্যতীত কে প্রত্যাশা করিবে? এই জন্য রামপ্রসাদের কল্পকলার স্বাভাবিক পরিণতির গানগুলির সহিত রামমোহনের রামপ্রসাদ-অনুকারী গানগুলির বাহ্য সাদৃশ্য কোন সাদৃশ্যই নহে।

"যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে"—ইহা জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া একটা স্পষ্ট উক্তি মাত্র। কিন্তু "ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি"—ইহা অনুভূতি—ইহা দর্শন—ইহা কাব্য—কাব্যের শ্রেষ্ঠ রূপান্তর। কাজেই আমি আবার আপনাদিগকে বলিতেছি "রামপ্রসাদ যে সুরে গাহিয়া গিয়াছেন—রামমোহন তার উল্টা সুর ধরিলেন।"

(২)

এইবার আমরা দেখিব, রামমোহনের ব্রহ্ম সঙ্গীত বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপ হইতে জন্মলাভ করিয়াছে কি না।

যে ধারায় চণ্ডীদাসের কাব্য-সৃষ্টি পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে—যে ধারায় রামপ্রসাদের কাব্য-সৃষ্টি কল্পকলার স্বাভাবিক পরিণতিতে গিয়া পৌঁছিয়াছে—বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপ হইতেই

এই দুই বিচিত্র ধারা যে জন্মিয়াছে তাহা আপনাদিগকে বলিয়াছি। রামমোহনের ব্রহ্ম সঙ্গীত এই দুই ধারার কোন ধারাতেই স্থান পাইতে পারে না। চণ্ডীদাসের ধারায় জ্ঞানদাস প্রভৃতি আছে, রামপ্রসাদের ধারায় কমলাকান্ত প্রভৃতি আছে। (১) ইহারাই ধারাকে প্রবাহিত রাখিয়াছে। রামমোহন এই দুই ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন। শুধু বিচ্ছিন্ন নয়—এই দুই ধারা হইতে বিপরীতগামী। রামপ্রসাদের ধারায় তাহাকে রাখিবার চেষ্টা বৃথা। তথাপি ব্রহ্ম সঙ্গীতের একটা স্বতন্ত্র ধারাও রাম-মোহন সৃষ্টি করিতে পারেন। সেই দিক হইতে বিচার করিলে

(১) চণ্ডীদাসের ধারায় জ্ঞানদাস প্রভৃতি আর রামপ্রসাদের ধারায় কমলাকান্ত প্রভৃতি আছেন একথা চিত্তরঞ্জন আগেও (বাঁকিপুর ও বগুড়া অভিভাষণ) বলিয়াছেন। যথা—

(ক) "চণ্ডীদাস হইতে কৃষ্ণকমল পর্য্যন্ত সেই একই ধারা স্রোতের মত বহিয়া আসিতেছে।" (বাঁকিপুর অভিভাষণ ১৯১৬)

(খ) "আজু গোঁসাই, রামদুলাল, কমলাকান্ত প্রভৃতি সকলেই রামপ্রসাদকেই অনুসরণ করিয়াছেন।" (বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭)

ডাঃ দীনেশ সেন বলেন—"বিদ্যাপতি যেরূপ গোবিন্দ দাসের আদর্শ, চণ্ডীদাস সেইরূপ জ্ঞানদাসের আদর্শ। * * কবিত্বের হিসাবে গোবিন্দ বিদ্যাপতি হইতে বহু নিম্নে নহে। * * গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসে, জ্ঞানদাস ও বলরামদাসে শক্তির পার্থক্য আছে। * * কিন্তু তাহা কেশ প্রমাণ।"

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৩য় সংস্করণ পৃঃ ৩১৫)

চিত্তরঞ্জন কিন্তু দীনেশবাবু হইতে এক্ষেত্রেও ভিন্ন মত পোষণ এবং প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথাই তুলিয়া দিতেছি।

(গ) "চৈতন্যের যুগে পরবর্ত্তী গীতি-কবিদের মধ্যে একমাত্র লোচন-দাসই, চণ্ডীদাসের ভাবের ও রসের অনুভূতির পর্দ্দায় গাইয়াছিলেন।

তাহার পর আর সমগ্র গৌরপদ তরঙ্গিনীর ভিতর এমন কেহ নাই, যাঁহার কবিতায় সে অনুভূতির লেশমাত্র পাওয়া যায়। * * গৌরাঙ্গের জন্মের পর বাঙ্গালায় আর এত বড় কবি জন্মায় নাই।"

(বাঁকিপুর অভিভাষণ ১৯১৬)

চিত্তরঞ্জনের সমালোচনা সর্ব্বত্রই স্বাতন্ত্র্য গরিমায় সমুজ্জ্বল। লোচন দাসকে চিত্তরঞ্জন এত উচ্চে স্থান দিলেন কেন? অনেক কারণের মধ্যে তিনটি কারণ অন্ততঃ উল্লেখযোগ্য। ১ম, বঙ্কিমের প্রভাব চিত্তরঞ্জনের উপর খুব স্পষ্ট। বঙ্কিম—তাঁহার 'কমলাকান্তে' 'একটি গীত' প্রবন্ধে লোচনের—"এস এস বঁধু এস" এই গানটিকে অতি অনুপম ব্যাখ্যায় অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ঐ গানটিকে চিত্তরঞ্জনও তাঁহার বাঁকীপুর অভিভাষণে যেন মুগ্ধ, অভিভূত হইয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ২য় কারণ, চিত্তরঞ্জন নিজেই দিয়াছেন। "বাঙ্গালার ঘর-কন্নার কথার ভিতর দিয়া, এমন করিয়া আর কখন কাব্যরস ফুটে নাই; এ অপূর্ব্ব অনুপম। ৩য় কারণ—"লোচনদাস গৌরাঙ্গের ভাবে বিভোর হইয়া গাইয়াছিলেন।"

রামপ্রসাদের ধারায় অনেকেই আছেন, তবু কমলাকান্তকেই খুব কাছাকাছি মনে হয়। একটি গান তুলিয়া দিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।

জাননারে মন পরম কারণ শ্যামা কভু মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ করিয়া ধারণ কখন কখন পুরুষ হয়॥
কভু বাঁধে ধড়া কভু বাঁধে চূড়া ময়ুর পুচ্ছ শোভিত তায়।
কখন পার্ব্বতী কখন শ্রীমতী কখন রামের জানকী হয়॥
হয়ে এলোকেশী করে লয়ে অসি দানবচয়ে করে সভয়।
(কভু) ব্রজপুরে আসি বাজাইয়ে বাঁশী ব্রজবাসীর মন হরিয়ে লয়॥
যেরূপে যে জন করয়ে ভজন সেইরূপে তার মানসে রয়।
কমলাকান্তের হৃদি-সরোবরে কমল মাঝে কমল উদয় হয়॥

বলা বাহুল্য রামমোহনের ব্রহ্ম-সঙ্গীত এই ধরণের নয়। এবং তা নয় বলিয়াই চিত্তরঞ্জন রামমোহনকে রামপ্রসাদের ধারায় রাখিয়া দেখিতে পারেন নাই। আর তা পারেন নাই বলিয়াই এই গোলযোগের সূত্রপাত।—সম্পাদক।

দেখা যাইবে যে, ইহা প্রথমতঃ কোন কাব্য সৃষ্টিই হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালার প্রবহমান ধারাগুলির (১) সহিত ইহার কোন সম্পর্কই নাই।

রামমোহনের "ব্রহ্ম সঙ্গীত" যে কোন কলাবিদের কল্প-কলার সৃষ্টি নয় তাহা এই ব্রহ্ম সঙ্গীতগুলিকে কল্পকলার

(১) বাঙ্গালার গীতি-কবিতাকে চিত্তরঞ্জন সর্ব্বত্রই ধারা হিসাবে আলোচনা করিয়াছেন। রামপ্রসাদ রচয়িতা শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—"আমার বাঙ্গালার গীতি কবিতার প্রবন্ধে আমি রামপ্রসাদকে পৃথক ভাবে আলোচনা করি নাই। চণ্ডীদাস হইতে বাঙ্গালায় কবিওয়ালারা পর্য্যন্ত গীতি কবিতার যে ধারা আছে—সেই ধারার বিষয় লিখিয়াছি।" কিন্তু এই অপ্রকাশিত বর্ত্তমান প্রবন্ধে যদিও শাক্ত ধারা সম্বন্ধে তিনি এক অতি সুসঙ্গত ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়াছেন—তথাপি রামপ্রসাদকেই বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বাদানুবাদমুখে আত্ম-পক্ষ সমর্থনের জন্য ইহা করিতে হইয়াছে।

বাঙ্গালায় প্রবহমান ধারা কেবল শাক্ত, বৈষ্ণব বা কবিওয়ালাতেই নিঃশেষ হয় নাই। খণ্ড-ধারা ও উপ-ধারা আরও অনেক আছে। পাঁচালী, ঝুমুর, ঢপ, কীর্ত্তন, বাউল, কর্ত্তাভজা, ভাট-গান, খেউর, মেয়েলী ব্রত—আরও কত আছে। একদিন এ সকল ধারাই খরবেগে প্রবহমান ছিল। এই সব খণ্ড ধারার মধ্যে একটা আভ্যন্তরিক যোগাযোগও ছিল। কিন্তু চিত্তরঞ্জন বলেন—রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীত এই সকল ধারা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কাজেই সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ায় যে, বাঙ্গালার প্রাণের সহিত রামমোহনী ধারার কোনই যোগাযোগ নাই।

মনে হয় যদি দীনেশবাবু রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীতকে রামপ্রসাদী ধারায় জোর করিয়া না ফেলিতেন,—আর যদি ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল 'obscurantism paraded" এই স্পষ্ট ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা চিত্তরঞ্জনকে অমার্জ্জনীয়রূপে অযথা আঘাত না করিতেন—তবে সম্ভবতঃ চিত্তরঞ্জন রামমোহন এবং তাঁহার ব্রহ্ম-সঙ্গীতের উপর এতটা জবরদস্তি করিতেন না।

—সম্পাদক।

সমালোচনার দিক হইতে বিচার করিলে অতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, রামমোহন কবি না হইয়াও কাব্য সৃষ্টিতে কেন হস্তক্ষেপ করিলেন। তাহার একমাত্র উত্তর ধর্ম্মসংস্কার। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণব সাধনার অনুরূপ কাব্য-সৃষ্টি হইয়াছে, গান হইয়াছে। শাক্ত সাধনার অনুরূপ কাব্য সৃষ্টি হইয়াছে, গান হইয়াছে। এই দুই সাধনাই নাম জপ ও রূপ ধ্যানের সাধনা। নাম ও রূপের মধ্য দিয়াই এই সাধনা মনুষ্যকে, বাঙ্গালীকে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির পথে যুগে যুগে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু রামমোহনের নির্গুণ নিরাকারের সাধনায় নাম রূপ গোড়াতেই পরিত্যাগ করিতে হয়। রামমোহনের ব্রহ্ম সাধনা বাঙ্গালার শাক্ত-বৈষ্ণবের সাধনার স্পষ্ট বিরুদ্ধ ও বিপরীত মার্গের সাধনা। অথচ যখন প্রত্যেক সাধনার অনুরূপ গান আছে কাজেই রামমোহন তাঁহার নির্গুণ সাধনার অনুরূপ গান রচনায় হস্তক্ষেপ করিলেন।

১। সে অতীত গুণত্রয় ইন্দ্রিয় বিষয় নয়
রূপের প্রসঙ্গ তাঁর কিরূপে সম্ভবে

২। নিরুপমের উপমা সীমাহীনে দিতে সীমা
নাহি হয় সম্ভাবনা
অচিন্ত্য উপাধি-হীনে অতিক্রান্ত গুণ তিনে
যত সব অর্ব্বাচীনে করয়ে কল্পনা।

বাঙ্গালীর সাধনায়, চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের কল্পকলায়

যত সব রূপ ও রসের বৈচিত্র্য ফুটিয়াছে তাহা রামমোহনের যুক্তিতঃ ও গানতঃ মিথ্যা। এবং চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদ প্রভৃতিরা "অর্ব্বাচীন"। না হইলে এরূপ সব মিথ্যা কল্পনা তাঁহারা করিবেন কেন? তার পর—

"নিরঞ্জনের নিরূপণ কিসে হবে বল মন
সে অতীত ত্রৈগুণ্য।"

ইহা মনের সহিত যুক্তি বিচার। কিন্তু মনে যে রসের উপজয় হইলে রূপ সৃষ্টি হইয়া সুর দেখা দেয়, এখানে সে মন নাই। কেহ বলিয়াছেন যে, যুক্তিও একটা রস, হইবে বা। কিন্তু এই যুক্তি রসের কাব্য সৃষ্টি কল্পকলার ধারায় বস্তুতঃই এক অনাসৃষ্টি সন্দেহ নাই। রামমোহনের নির্গুণ ব্রহ্ম সাধনা যেরূপ বাঙ্গালার সাধনার বিরোধী এবং এরূপ হইবার একমাত্র কারণ যে, রামমোহন বাঙ্গালার প্রাণের সহিত পরিচয় লাভ করিবার অবকাশ করিতে পারেন নাই, তাই তাঁহার সাধনা বাঙ্গালার প্রাণের সাধনার বিপরীত। তাই তাঁহার গান—যদিও গান হয় নাই—বাঙ্গালার প্রাণের গানের ধারার বিপরীত!

যাঁহারা "আর্ট ফর আর্টস সেক" বলিয়া রব তুলিয়াছেন—(১) যাঁহারা আর্টকে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিয়োগ

(১) ইহা চিত্তরঞ্জন কর্ত্তৃক রাবিন্দ্রিক সম্প্রদায়ের উপর কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাত। এই সম্প্রদায় তখন বলিতেন,—উদ্দেশ্যমূলক যেই হওয়া আর অমনি কাব্যের আত্যন্তিক রসাভাস জনিত নিশ্চিত অপঘাত মৃত্যু। কাব্য বা সঙ্গীতের কোন উদ্দেশ্য থাকিবে না। থাকিলে চলিবে না।

করিতে গেলে আর্টই হয় না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন— তাঁহারা যদি প্রণিধান করিয়া দেখেন তবে দেখিতে পাইবেন— রামমোহনের ব্রহ্ম-সঙ্গীত ব্রহ্ম-সাধনা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মানুভূতিতে পৌঁছাইয়া দিবার পথের কোন খবরই দিবে না। ইহাতে ব্রহ্ম-বিরহ নাই, ব্রহ্মানুভূতিও নাই, আছে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম সংস্কার।

রামমোহন নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মবাদী, বাঙ্গালীকেও তিনি সেই দিকে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক। ইহাই তাঁহার ধর্ম্ম-সংস্কার, গান তাঁহার একটা উপায় স্বরূপ। কাজেই গান বাঁধিলেন—

"সে অতীত ত্রৈগুণ্য"

তাই নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বে জগৎকে মিথ্যা মায়া বলিয়া কত কত জ্ঞানী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সেই মায়াবাদ সিদ্ধান্তে নাম-রূপ মাত্রই ভ্রম। রামমোহন নির্গুণ ব্রহ্মের গানের সঙ্গে কাজেই মায়াবাদের গানও বাঁধিলেন। :

যদি তাই হয়, তবে তাঁহাদের মতে রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীত, গান বা কবিতা কিছুই হয় নাই। কেননা চিত্তরঞ্জন নিখুঁত ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে ইহা স্পষ্ট উদ্দেশ্যমূলক।

কথাটা আরো খুলিয়া বলা প্রয়োজন। সেই বাদানুবাদের ঝটিকা-বর্ত্তের দিনে একদিন আমি চিত্তরঞ্জন কর্ত্তৃক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হই। পণ্ডিত হরপ্রসাদ কিছুক্ষণ বিবেচনা করিয়া আমাকে বলিলেন যে, রামমোহনের ব্রহ্ম-সঙ্গীতে তাল, লয়, মান, সব ঠিক আছে, কিন্তু নিরাকার বেদান্ত এত বেশী যে এগুলি গান হয় নাই। আমি ফিরিয়া আসিয়া চিত্তরঞ্জনকে সেই কথাই বলিয়াছিলাম।—সম্পাদক।

নিদ্রাবশে দেখ যেমন বিবিধ স্বপন
প্রপঞ্চ জগৎ তেমন ভ্রমে সত্য দরশন,
অতএব দেখ ভেবে যিনি সত্য ভজ তারে
মহামায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন
রজ্জুতে হয় যেমন ভ্রমে অহি দরশন।

ইহা মায়াবাদ—শঙ্কর-তর্জ্জমা—এবং ইহাই 'নব্য সমাজের' গান। রামমোহন মূর্ত্তি-বিরোধী। কাজেই তাঁহাকে নাম রূপের বিরোধী হইতে হইয়াছে—নিগুর্ণ ব্রহ্মের গান বাঁধিতে হইয়াছে—মায়াবাদের গান বাঁধিতে হইয়াছে। শুধু তাই নয়। মায়াবাদ আর নির্গুণ ব্রহ্ম আসিলেই—সন্ন্যাস ও বৈরাগ্য আসিয়া পড়ে। কাজেই রামমোহন বৈরাগ্যের গান বাঁধিলেন—বিষয়ে বিতৃষ্ণার গান বাঁধিলেন।

সকলি অনিত্য হয় দারাসুত ধনজন
ভুল না মায়ায় আর ত্যজ আশা অহঙ্কার
ভজ নিত্য নির্ব্বিকার পুনর্জন্ম হরণ।

আর একটা গান আছে, "পুনশ্চ না হবে কায়া।" রামমোহন এখানে জন্মান্তরবাদী—পুনর্জন্মের ভয় দেখাইয়া শঙ্কর-বেদান্তের গান বাঁধিয়াছেন।

স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে
বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে

কোন্ রস হইতে এই গান জন্মিয়াছে—আর ইহা কি গান হইয়াছে ?

তারপর তীর্থযাত্রা ও পৌত্তলিকতা—কাজেই কুসংস্কার। এই কুসংস্কার দূর করিবার নিমিত্ত রামমোহন বাঁধিলেন—

সর্ব্বব্যাপী তাঁর আখ্যা।
এই সে বেদের ব্যাখ্যা
অন্যথা করিতে চাহ তীর্থ দরশনে ?

শাস্ত্রের দোহাই দিয়া গান রচনা—বোধহয় গানের ইতিহাসে এই প্রথম। যদিও ইহা একটা সংস্কৃত শ্লোকের তর্জ্জমা। এইরূপ শাস্ত্রের দোহাই আরও বহু গানে দেখা যায়। যুক্তি ও শাস্ত্রের দোহাই—রামমোহন একসঙ্গে এই দুই অস্ত্রই ধর্ম্ম সংস্কারে পরিচালনা করিলেন। (১) আমি বলিয়াছি

১। "When we look back to the traditions of ancient nations, we often find them at variance with each other; and when, discouraged by this circumstance, we appeal to reason as a surer guide, we soon find how incompetent it is alone to conduct us to the object of our pursuit. We often find that instead of facilitating our endeavours, or clearing up our perplexities it only serves to generate a universal doubt incompatible with principles on which our comfort and happiness mainly depend. The best method perhaps is, neither to give ourselves up exclusively to the guidance of the one or the other, but by a proper use of the lights furnished up by both, endeavour to improve our intellectual and moral faculties".—Raja Rammohan Rav.

—তাঁহার গান, ‹.েন নহে—ধর্ম্ম সংস্কার। কাজেই এখানেও যুক্তি ও শাস্ত্রের দোহাই। প্রাণের যে অনুভূতি জন্মিলে বাহিরের শাস্ত্র বিচার গোস্পদের সঙ্গে তুলনীয় মনে হয়—সে অনুভূতি চণ্ডীদাসে রামপ্রসাদে দেখা গিয়াছে। তাঁহাদের কল্পকলায় শাস্ত্র-নিরপেক্ষতার যথেষ্ট পরিচয়ও আছে। কিন্তু রামমোহনের সে সাধনার সিদ্ধ অবস্থার অনুভূতি ছিল না। তাঁহার কল্প-কলাই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। কাজেই রামপ্রসাদ যার বলে শাস্ত্র-নিরপেক্ষতা দেখাইয়াছেন—রামমোহনের সে ভরসা না থাকায় তাঁহাকে তীর্থগমনের বিরুদ্ধে গান লিখিতে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রের দোহাই দিতে হইয়াছে। আমি রামমোহনের গানে সাধনার কোন ইঙ্গিত পাই না, যুক্তির অবতারণা মাত্র দেখিতে পাই। হয়ত আমার দুর্ভাগ্য (২) কাজেই আমি যাহা বুঝিয়াছি স্পষ্ট তাহাই বলিব।

তারপর রামমোহনের গানে দ্বৈতবাদের প্রতিবাদ আছে—এমন কি প্রত্যক্ষবাদেরও অবতারণা আছে।

এখনও এই নির্গুণবাদ, অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, জন্মান্তরবাদ, বৈরাগ্যবাদ, প্রত্যক্ষবাদ প্রভৃতির যে আবাদ রামমোহনের গানে দেখা যায়, তাহা কল্পকলার রূপান্তর,—না ধর্ম্ম সংস্কার—সুধীজন বিচার করিবেন। ✓

---

(২) "ক্ষিপ্ত সেই স্বধর্ম্ম খোয়ায় খোসামোদে।"
(সুন্দর প্রতি কালীর অভয় প্রদান—বিদ্যাসুন্দর
—রামপ্রসাদ।)

সুতরাং রামমোহনের গান প্রথমে কোন গানই হয় নাই। ইহা কোন কাব্য নয়—কলাসৃষ্টিও নয়। দ্বিতীয়, বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপ হইতে ইহার জন্ম হয় নাই। বাঙ্গালার রস-বৈচিত্র্যের রূপ-বৈচিত্র্যে ইহার স্থান নাই। আমি এই দুই দিক হইতেই সংক্ষেপে যতদূর সাধ্য রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীতের আলোচনা করিলাম। এবং রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীতের ভাব দেখিয়া মনে হয় যে, রামপ্রসাদের মৃত্যুর বৎসরের শেষে জন্মিয়া—বাঙ্গালার নাম রূপকে ধর্ম্মসাধনা হইতে পরিত্যাগ করিয়া শঙ্কর-বেদান্তের বাঙ্গালা সংস্করণের যতই প্রয়োজন তিনি বোধ করিয়া থাকুন না কেন (১) তাঁহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতকে কোন গানের পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে না। এবং বাঙ্গালার প্রাণের সহিত টানিয়া তুলিয়া ইহার কোন যোগ স্থাপন করা যায় না।

কাজেই আমি বলিয়াছিলাম এবং আবার বলিতেছি যে, রামমোহন বাঙ্গালা দেশের ধর্ম্ম সাধনাকে বুঝিতে পারেন নাই—তাঁহার ব্রহ্ম সঙ্গীত বাঙ্গালীর গান হইতে পারে নাই—বাঙ্গালার প্রাণের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না বলিয়াই—

(১) অতএব শঙ্কর আচার্য্যের নিন্দা করাতে এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মের ক্রমে মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়। আর আমাদের প্রতি শঙ্কর আচার্য্য মতাবলম্বী করিয়া যে কটাক্ষ করিয়াছেন, সে আমাদের শ্লাঘা; সুতরাং ইহার উত্তর কি লিখিব।

(রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী
গোস্বামীর সহিত বিচার ১০৩ পৃঃ)

বাঙ্গালার গীতি কবিতার ধারার নবযুগে—এই মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদ-রেখা—ক্রমেই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর ফুটিয়া উঠিতেছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন রামমোহনকে বিচার করিবার অধিকার ও যোগ্যতা আমার নাই। (২) কেন নাই—তা তাঁহারাও বলেন নাই, আমিও বুঝি না। আমাকে ফেরঙ্গ বলিয়া বিদ্রূপ করা হইয়াছে। যে সংস্কারে মন্দির ছাড়িয়া—

২। (ক) Another Kavitakar, however, has arisen who claims to have now discovered that it is in the soul that they have been hard hit, that Rammohan has been like a nightmare sitting on the essentially Vaishnava Soul of Bengal 'To the rescue" "to the rescue" is the call.

How far the soul of Bengal is Vaishnavic and what acquaintance the writer can claim with Rammohan will form the subject of our enquiry in our next.

[The Indian Messenger
Feb. 24. 1918—P 76]

(খ) The Soi-disant nationalists who know him not or deny him are the real Ferangas, and do not belong to the line of the Rishis, however much they may protest their Vedicism or Vaishnavism.

[The Indian Messenger
April 7. 1918—P 147.]

উপরে উদ্ধৃত বিদ্রূপ বাক্য চিত্তরঞ্জনের উপর প্রয়োগ করা হইয়াছিল। এবং তিনি ইহার উত্তর দিয়াছেন।

—সম্পাদক।

হিমালয় বিন্ধ্য ছাড়িয়া—ইফেল টাওয়ারের কথা মনে আসে—সে সংস্কার বাঙ্গালীর নহে ফেরঙ্গের। সেই ফেরঙ্গ যতই স্পর্দ্ধা করুক—আমি জানি—আমাকে বিচার করিবার, দণ্ড দিবার অধিকার—এই বাঙ্গালা দেশে কেবল এক বাঙ্গালীর আছে—আর কাহারও নাই।